শব্দদোসর

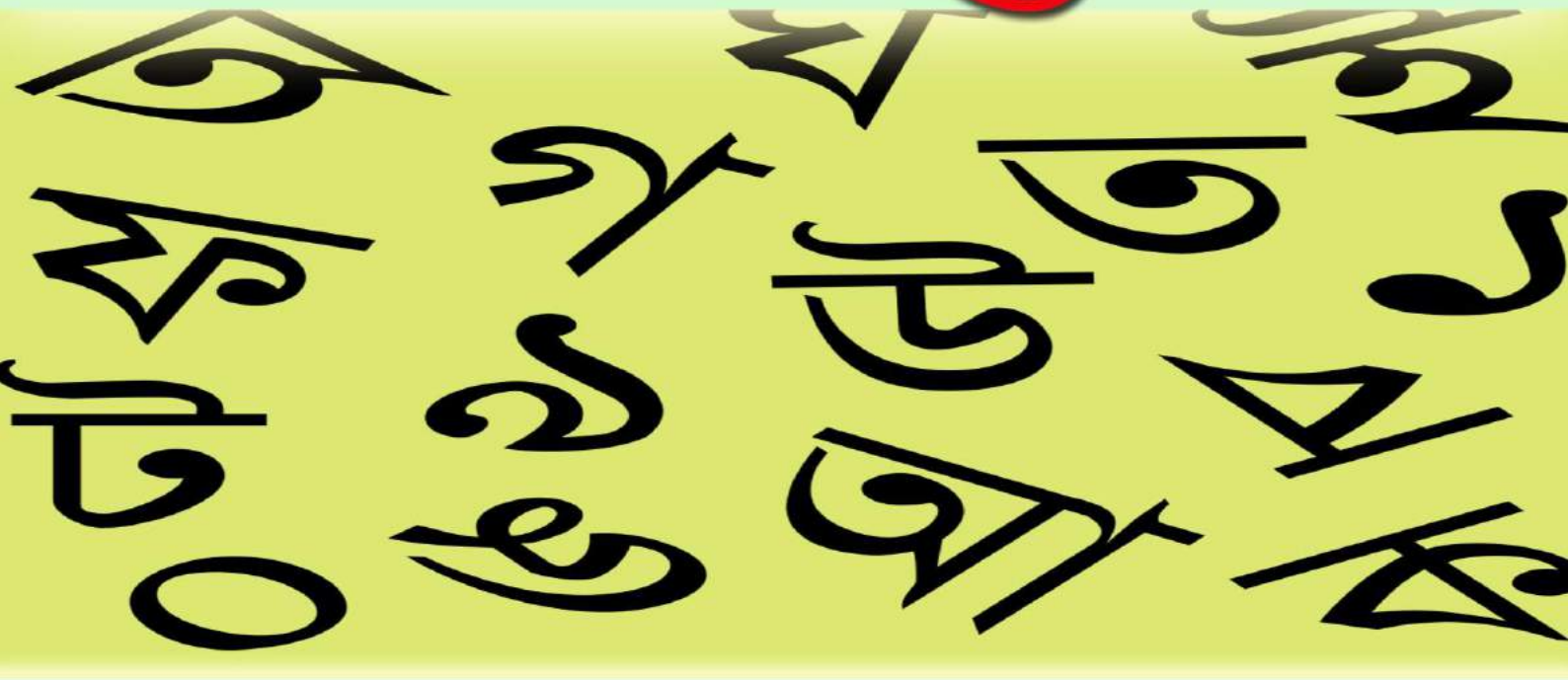

আলাপী মন ওয়েবের নিবেদনে

শব্দ দোসর

সম্পাদকঃ- রীণা চ্যাটার্জী ও অমল দাস

প্রকাশঃ- বৈশাখ-১৪২৮। এপ্রিল-২০২১
পি.ডি.এফ স্বত্বঃ- আলাপী মন ওয়েব
প্রচ্ছদ ও পি.ডি.এফ সজ্জা - অমল দাস

প্রকাশক
আলাপী মন- সাহিত্যের আঙিনায়
(www.alapimon.com)
ঠিকানাঃ- সল্টলেক সেক্টর-১ , কলকাতা- ৭০০০৬৪

যোগাযোগ
মেইলঃ- alapimon@gmail.com
হোয়াটস অ্যাপঃ- 8910116253

অবতরণিকা

সুধী,

মনের ভেতর কথাগুলো চীৎকার করে নিরুচ্চারে দানা বাঁধে নীরবে। আগল খুলে বেরিয়ে আসতে চায়- শব্দের হাতে হাত রেখে।

কলমের আঁচড়ে প্রাণ পায় শব্দরা- মনের কথারা মূর্ত হয়ে ওঠে পলকে।

জীবনের ক্ষণস্থায়ী পথটুকু কখনো আবেগের, কখনো ভালোবাসার, কখনো দুঃখের, কখনো আঘাতের কখনো প্রতিবাদের- কখনো একা পথ চলা, কখনো বা সাথীর সঙ্গে চলা। সাথী পাওয়া- সাথে চলা এ এক পরম পাওয়া। সে সাথী যদি হয় শব্দ- জয় করে নেওয়া যায় পৃথিবী অনায়াসে। কলম-শব্দের মেলবন্ধন হোক চিরন্তন সকল শব্দপ্রেমীর কাছে। খুলে যাক মনের অভিমুখ- ক্যানভাসে নিত্য ফুটে উঠুক শব্দের নানা রঙের আল্পনা।

আলাপী মন-এর তৃতীয় পিডিএফ সঙ্কলন "শব্দ দোসর" নানা রূপে, বহু বর্ণে সাজিয়ে তুলেছেন ভালোবেসে স্বজন সাথীরা।

সবার প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইলো আলাপী মন-এর পক্ষ থেকে। নববর্ষের শুভেচ্ছা ও শুভকামনা নিরন্তর।

শুভেচ্ছান্তে-
আলাপী মন

সূচীপত্র

গল্প

স্বপ্নের জাল এবং জাল স্বপ্ন	অরুণ কর	1
স্কোয়ার সেন্টিমিটার	কল্যাণ মৈত্র	9
হুল	রীণা চ্যাটার্জী	13
শক্ত লাঠি	লোপামুদ্রা ব্যানার্জী	17
মিথ্যা গুজব	তমালী বন্দ্যোপাধ্যায়	21
আমরা যখন কুরুক্ষেত্রে মাস্টারমশাই	অঞ্জনা গড়িয়া	23
সেঞ্জ	সঞ্জিত মণ্ডল	25
মায়াবী রাতে	শচীদুলাল পাল	28

কবিতা

উৎসব সমাচার	পারমিতা ভট্টাচার্য	30
লালিমা	অমল দাস	31
ভালোবাসার গান	জ্যোৎস্না ভট্টাচার্য ত্রিবেদী	32
আনন্দ'র খোঁজে	সীমা চক্রবর্তী	33
প্রাণের শহর কোলকাতা	ঋতুপর্ণা পতি কর	34
খুঁজে চলা সেই শব্দ	সুজাতা দাস	35
মেঘ পিওনের ডাক	পাপিয়া ঘোষ সিংহ	36
আশা	মানিক দাক্ষিত	37
সমর্পণ	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	38
মন খারাপের দিন	অমিতাভ সরকার	39
ভ্যালেন্টাইন	উজ্জ্বল সামান্ত	40

নাটক

"নারী শক্তি"	রাখী চক্রবর্তী	41
খুশি থাকা (শ্রুতি নাটক)	পায়েল সাহু	44

স্বপ্নের জাল এবং জাল স্বপ্ন

অরুণ কর

মহাশূন্যে হারিয়ে যাওয়ার সময় কি এমনই অনুভূতি হয়? একেই কি অমৃতলোক বলে? একেবারে নির্ভার শরীর, শীতাতপ কিংবা ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতি নেই। নেই শারীরিক কষ্টও। কেমন যেন পালকের মত ফুরফুরে মৃদু কাঁপন নিয়ে হাওয়ার টানে দুলতে দুলতে নামা-ওঠার খেলা। দ্বিদলবাসিনীর মনে হল, তিনি যেন মেঘের মত ভেসে ভেসে চলেছেন। কিন্তু কোথায় যে চলেছেন, ঠিক ঠাহর করতে পারছেন না। তাঁর দৃষ্টিপথের সবকিছুই যেন ঝাপসা, কুয়াশাচ্ছন্ন। তাতে অবশ্য চলার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। কারণ, এ চলার ক্লান্তি নেই, পথ চেনার দায় নেই, ইচ্ছে-অনিচ্ছের বালাই নেই, হৃদয় যেন উৎকণ্ঠা-আনন্দের উর্ধে এক অনির্বচনীয় নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

লেখক - অরুণ কর

হঠাৎ দ্বিদলের মনে হল, আচ্ছা, সরিতশেখর এখন কী করছে? সে কি খুব রেগে আছে? ওঁর কি এখন চা খাওয়ার সময়? অথবা বাজারে যাবে, অথচ পার্স কিংবা বাজারের থলেটা খুঁজে পাচ্ছে না বলে চেঁচামেচি করছে?

দ্বিদল ছাড়া সরিতশেখরের এক মুহূর্তও চলে না। উঠতে দ্বিদল, বসতে দ্বিদল, ওর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে যেন দ্বিদল। সেবার কল্যাণীর বাচ্চা হওয়ার সময় শান্তনু খুব করে গুরগাঁও নিয়ে যেতে চেয়েছিল দ্বিদলকে। সব ঠিকঠাক, ট্রেনের টিকিট পর্যন্ত কাটা হয়ে গেছে। হঠাৎ যাওয়ার আগের দিন সরিতশেখরের প্রচন্ড শরীর খারাপ হল। তাঁর বুক ধড়ফড় করতে লাগল, বার বার বাথরুম যাওয়া, প্রচন্ড ঘাম হওয়া, সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড। গোপাল মুখুজ্জে পরিচিত ডাক্তার, পাড়ায় থাকেন, কল দিলে এখনো বাড়িতে রুগি দেখতে আসেন। তিনি এসে আঁতিপাঁতি করে পরীক্ষা করেও সরিতশেখরের শরীরে রোগের কোনো চিহ্ন খুঁজে পেলেন না। সেটা বলতে সরিতশেখর ডাক্তারের উপরেই রেগে গেলেন। বললেন, আমি কি মিছে কতা কচ্চি?

গুচ্ছের টনিক আর অ্যান্টাসিড লিখে দিয়ে গোপাল মুখুজ্জে ডবল ফি নিয়ে বেরোবার সময় হাসতে হাসতে বলে গেলেন, আপাতত রোগ ধরা গেল না বটে, তবে বাড়াবাড়ি হলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে থরো চেক-আপ করাতে হবে। স্টেথো আর প্রেশার মাপার যন্ত্র দিয়ে তো সব রোগ ধরা যায় না!

সরিতশেখর দ্বিগুণ রেগে বললেন, ঘোড়ার ডাক্তার!

শান্তনুকে ফোন করা হল। সোমপ্রকাশ ছুটল টিকিট ক্যান্সেল করতে। দুপুরের পর সরিতশেখরের শরীর আপনা থেকেই ভালো হয়ে গেল। বিকেলে বাজার থেকে বড়সড় একখানা গোটা ইলিশ মাছ এনে বললেন, দাগাগুলো ভালো করে সর্ষে-বাটা দিয়ে ভাপা করো। মুড়ো দিয়ে কচু শাক আর আর ল্যাজার আগের টুকরোগুলো তেঁতুল দিয়ে টক করো। ইলিশির টক শেষ কবে খায়চি, মনে পড়ে না! মা বড় ভালো রাঁনত!

অভিমানে এর পর শান্তনু দু' বছর কলকাতায় আসেনি। কল্যাণীকেও পাঠায়নি। শেষে বাপনের জন্মদিন

উপলক্ষ্যে সরিতশেখরকে সঙ্গে নিয়ে গুরগাঁও গিয়ে জামাইয়ের অভিমান ভাঙাতে হয়েছিল।

অনেক দূরে কারা যেন ফিস ফিস করে কথা বলছে! দ্বিদলবাসিনী কান পেতে রইলেন। গলাটা চেনা চেনা লাগছে। স্বপ্নময় কি? কিন্তু তাই বা কী করে হবে? সে তো শিলিগুড়িতে কী সব কাজে আটকে আছে। তার উপর মেয়ের পরীক্ষা, প্রিপারেটরি ক্লাস হলেও ইংলিশ মিডিয়াম ইস্কুলে পড়াশুনোর নাকি ভয়ঙ্কর চাপ! সরিতশেখরের সঙ্গে কবে যেন কথা হল। দ্বিদলের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু টেলফোনের এক প্রান্তের কথা শুনেই দ্বিদল কথা বাড়াতে চাননি। সরিতশেখরকে ইঙ্গিতে রান্নায় ব্যস্ত আছেন বলে ফোন কেটে দিতে বলেছিলেন। সরিতশেখর স্বপ্নময়ের সঙ্গে কবে কথা বলেছিল? গতকাল কি?

দ্বিদলবাসিনী চোখ খোলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। চোখের পাতা দু'টো কেউ যেন লিউকোপ্লাস্ট দিয়ে আটকে দিয়েছে। কারা যেন আবার কথা বলছে। এবার কণ্ঠস্বর কিছুটা স্পষ্ট। একটা মেয়ের গলাও যেন শোনা যাচ্ছে। তবে কি কল্যাণী এসেছে? গুরগাঁও থেকে কবে এলো সে? বাপনের পরীক্ষা ফেলেই চলে এল? না! কল্যাণী নয়, ওর গলাটা আরো তীক্ষ্ণ, রিনরিনে, এতটা মোটা নয়। মেজ বৌমা কি? দ্বিদলবাসিনী মনে মনে শঙ্কিত হলেন। আবার নির্ঘাৎ কোন দাবি নিয়ে ঝগড়া করতে এসেছে। মেজবৌমা আসা মানেই এটা চাই, ওটা চাই, হকের জিনিস কেন পাবে না, সেসব নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। দ্বিদলের গলার পাঁচ ভরি সোনার হার বা হাতের মকর-মুখো বালা দুটো যে শেষে কে হাতাবে, সেটা নিয়ে মেজবৌমার দুশ্চিন্তার শেষ নেই! শেষ যেদিন এসেছিল, সে কী সাংঘাতিক কান্ড! মধ্যমগ্রামের জমি বিক্রির টাকার ভাগ কেন সে পাবে না, তাই নিয়ে তুমুল চিৎকার-চেঁচামেচি। সারা পাড়ার লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিদলবাসিনী শুধু একবার বলার চেষ্টা করেছিলেন, বাংলাদেশ থেকে পাঠানো টাকায় দমদমের জমিটা তো তিন ভাইয়ের নামে কেনার কথা ছিল। বিধান সেটা কাউকে না জানিয়ে নিজের নামে করে নিয়েছে। নাগের বাজারে বিধানের অমন যে চালু ওষুধের দোকান, সেও তো সরিতশেখরের পাঠানো টাকাতেই শুরু হয়েছিল। বরং সোমপ্রকাশ সেই অর্থে কিছুই পায়নি, চাকরি-বাকরি করে না, এ-দেশ ওদেশ করতে করতে বয়েস পেরিয়ে গেছে। সবে রাস্তা তৈরির কন্ট্রাক্টরি শুরু করেছে, টাকাটা না পেলে ও যাবে কোথায়?

কিন্তু পুরোটা বলার আগেই মেজবৌমা এসে দ্বিদলের মুখ চেপে ধরেছিল। পাড়ার লোকরা না থাকলে হয়তো খুনোখুনি হয়ে যেত। শ্বশুর-শাশুড়ি সম্পর্কে মেজবৌমার বাছা বাছা অভিধান-বহির্ভূত শব্দোচ্চারণে সরিতশেখর লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। কোন কথা বলতে পারেন নি। পুত্রবধূর সেদিনের সেই মারমুখী আক্রমণে এতটা আহত হয়েছিলেন যে, রাত্রে কিছু খেতে চাইলেন না, এমনকী এই ঘটনার পর লজ্জায় টানা সাতদিন ঘর থেকে বেরোননি পর্যন্ত।

বহুদূরে আবার কারা যেন উত্তেজিত হয়ে বলছে, ঐ তো, চোখের পাতা কাঁপছে।

কার চোখের পাতায় কাঁপনের কথা বলছে ওরা? দ্বিদল অনেক কষ্টে ধীরে ধীরে চোখ খোলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছুই দেখতে পেলেন না। মুখের ওপর তপ্ত নিঃশ্বাসের শব্দে শুধু মনে হল যেন একখানা মুখ ওর মুখের ওপর ঝুঁকে আছে। কে সে? মনের পর্দায় সেই ঝুঁকে পড়া মুখখানার ছবি ফেলে অনেক চেষ্টা করেও পরিচিতদের কারো সঙ্গে মেলাতে পারলেন না।

হঠাৎ দ্বিদলের মনে হল, বাঁ-হাতের কব্জির উপরে কিছু একটা যেন কামড়ে দিল। স্বপ্নের উড়ানের মধ্যে আচমকা এই ব্যথার অনুভবে দ্বিদলবাসিনী একটু বিহ্বল হয়ে পড়লেন। বহুদিন আগের এক বিস্মৃতপ্রায় যে মনের পর্দায় এসে রঙ বোলাতে শুরু করল। জায়গাটা মোবারকপুরে বাপের বাড়ি। তরুণী বয়েস, বিতান তখন সবে হয়েছে। পল্টু-সল্টুকে নিয়ে খলিসখালি থেকে বড়দি শতদলবাসিনীও এসেছে। বড় জামাইবাবু ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার জন্যে আসতে পারেননি।

সুন্দরবনের মহালে দ্বিদলের বাবা জয়নারায়ণের প্রচুর জমিজমা ছিল। সবটাই প্রায় জলা জমি, বছরে একবার মাত্র চাষ হত। ওখানকার পোদেরা সেসব দেখাশোনা করত। 'পোদ' বললে ক্ষুণ্ন হয়ে ভুল শুধরে দিয়ে বলত, আমরা 'পৌন্ড্রক্ষত্রিয়' গো মা ঠাইরেন!

শীতের সময়ে বছরে একবার তারা ধানের দাম হিসেব করে টাকা দিতে আসত মোবারকপুরে। নৌকোর খোলে করে কলসি-ভর্তি খেঁজুরের গুড়, রাশি রাশি গলদা চিংড়ি, কচ্ছপ আর ঘিলু-ভর্তি বড় বড় কাঁকড়া নিয়ে আসত বাবুকে দেয়ার জন্যে।

সেবার পোদেদের আনা কাঁকড়া কাটতে গিয়ে একটা কাঁকড়া দ্বিদলের আঙুল কামড়ে ধরেছিল। বাপরে, সেকী যন্ত্রণা! দ্বিদল রক্ত দেখে বঁটির উপরেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। এমন মোক্ষম কামড় যে দাঁড়াটা ভেঙে দিয়েও কাঁকড়ার চোয়াল থেকে দ্বিদলের আঙুল ছাড়ানো যায়নি। সে এক বিশ্রী রক্তারক্তি কাণ্ড। জয়নারায়ণের বন্ধু এল এম এফ ডাক্তার শীতল ঘোষ এসে কাঁকড়ার দাঁড়া ছাড়িয়ে হাতের আঙুলে সেলাই করে দিয়েছিলেন। তারপর তিন দিন টানা জ্বর, ঘিলুভর্তি সেই কাঁকড়া আর দ্বিদলের খাওয়া হয়নি। পাটকেলঘাটা হাটে হাটুরেদের মুখে খবর পেয়ে রাতদুপুরে শ্বশুরবাড়িতে এসে হাজির হয়েছিলেন সরিতশেখর। খুব রাগ করেছিলেন। সকাল হতেই জ্বর-গায়ে দ্বিদলকে নিয়ে সাগরদাঁড়ি ফিরে এসেছিলেন। হাতের আঙুলে সেদিনের সেই কাঁকড়ার কামড়ের দাগ দ্বিদলের হাত থেকে আজও মেলায়নি।

-- অ্যা! একটা চ্যানেল করতে শেখেনি, গলায় স্টেথো ঝুলিয়ে ডাক্তার হয়েছেন! যাও, যাও, হাঁ করে দেখতে হবে না। জলদি গজ-ব্যান্ডেজ নিয়ে এসো। সামান্য একটা চ্যানেল করতে গিয়ে রক্তারক্তি করে ছাড়লে!

কে যেন কাকে ধমকাচ্ছে। গলাটা গমগমে, তবে কি সরিতশেখর এলো?

দ্বিদল ফের চোখের পাতাটা খোলবার চেষ্টা করলেন।

--এই দেখো, কেমন করে চ্যানেল করতে হয়।

ফের হাতে যেন কাঁকড়ার কামড়, কিন্তু দ্বিদল তা উপেক্ষা করে কান খাড়া করলেন।

না! এ অন্য কেউ সরিতশেখর নিশ্চয় রাগ করে বাড়িতে বসে আছে। আসলে সারা জীবনে এক বেলার জন্যেও দ্বিদলবাসিনীকে একা কোথাও ছাড়েননি তিনি। ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার পর সরিতশেখরের এই অদ্ভুত আচরণ নিয়ে মাঝে মাঝে খুব বিব্রত হতে হত দ্বিদলকে। তবু পারস্পরিক সাহচর্যের এই দীর্ঘ অভ্যাস দ্বিদলবাসিনীরও মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে। সরিতশেখরকে না পেয়ে একটু যেন হতাশই হলেন তিনি। জায়গাটা যে কোথায় এবং সেখানে উনি কীভাবে এলেন, ভাবতে ভাবতে দ্বিদল আবার ঘুমের দেশে তলিয়ে গেলেন।

দুই

-কানের দুলজোড়া আর হাতের বালাটা খুলে নাও।

পুরুষ কণ্ঠ। কার কানের দুলের কথা হচ্ছে? দ্বিদল নিজের কানে কেমন যেন সুড়সুড়ি টের পেলেন।

-ওগুলো আমার কাছে থাক। মা সেরে উঠলে আমি পরিয়ে দেব।

-না। আমার কাছে থাক। একবার তোমার হাতে পড়লে আর ও জিনিস ফেরত আসবে না, সে কথা সবাই জানে!

--বাজে কথা বলিস না ছোট। মা কি তোর একার?

--অ্যা, খুব যে মা মা করছ এখন! এতদিন তো একটু খোঁজও নাওনি! ওমা, মা'র গলার হারটা কোথায় গেল? ওটা কি বাড়িতে রাখা আছে?

--বাড়িতে কে ছিল যে, খুলে রাখবে? অ, তুমি রেখেছ? বেশ করেছ! তা এতক্ষণ ঘাপটি মেরে বসে থাকার কি হয়েছে? বলবে তো, ওটা তোমার কাছে আছে! ভাগ্যিস আয়াটা তোমাকে হারটা খুলে নিতে দেখেছিল!

--আহা, ওরাই তো বলল, গয়নাগাঁটি না খুললে স্যালাইনের জন্যে চ্যানেল করতে অসুবিধা হচ্ছে। তোমরা কেউ ছিলে না-

--তাই তুমি খুলে নিয়ে গায়েব করে ফেললে! চমৎকার সাফাই, জজেও মানবে! তবে স্যালাইনের চ্যানেল

কারো গলায় করে বলে তো বাপের জন্মেও শুনিনি! তোমার অবশ্য ডাক্তার নিয়ে কারবার-

-- তোমরা সবাই ছোটলোক! তোমাদের গুষ্টিসুদ্দু ছোটলোক। যেমন মা তেমনই ছা!

--অ, অমনি মা খারাপ হয়ে গেল, না! লেজে পা পড়লেই মানুষের আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়ে!

হঠাৎ মেঝেতে ধাতব কোনকিছু ছুঁড়ে ফেলার ঝন ঝন শব্দ হল। কেউ একজন যেন দুদ্দাড় দৌড়ে এল।

-আ! কী হচ্ছে? এখন কি ঝগড়া করার সময়, না এটা ঝগড়া করার জায়গা? যান, সবাই বাইরে যান!

পুরুষ কণ্ঠের ধমকটা স্পষ্ট শুনতে পেলেন দ্বিদলবাসিনী। বাঁ-হাতটা যেন খুব টন টন করছে। জয়নারায়ণ কি শীতলজ্যাঠাকে খবর দিয়েছেন? শীতলজ্যাঠা দ্বিদলকে আদর করে বলতেন "পরি-মা। দ্বিদল নাকি পরির মত সুন্দরী ছিলেন ছোটবেলায়। বড়বেলায়ই বা কম কিসে? নিন্দুকেরা বলে, দ্বিদলের রূপের কাছিতে সরিত এমন বাঁধা পড়েছে যে সারাজীবন পাক খেতে খেতে বেচারার প্রাণ গেল!

শীতল জ্যাঠা নিজের ছেলের সঙ্গে দ্বিদলের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বন্ধুর মেয়ে,পালটি ঘর। বকুন দাদাকে দেখতে ছিল কৃষ্ণঠাকুরের মত। শ্যামলা রঙ, লম্বা দোহারা চেহারা, টানা টানা চোখ, কোঁকড়া একমাথা চুল। তালা হাই স্কুল থেকে বকুনদাদা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করেছিল। তখনও বাংলাদেশ হয়নি। দেশটা পূর্ব পাকিস্তান। গাঁ-গঞ্জের লোক ভেঙে পড়ছিল বকুন দাদাকে দেখতে। হেড মাস্টার বসিরুদ্দিন শেখ নিজে গোরুর গাড়ির ছই খুলে তাতে বকুন দাদাকে বসিয়ে কপিলমুনির হাট পর্যন্ত ঘুরিয়ে এনেছিলেন। বলেছিলেন, তাঁর মাস্টার জীবনের সেরা মেডেল সাম্যময় ঘোষ। সাম্যময় বকুন দাদার ভালো নাম।

কিন্তু বকুন দাদা সেই যে বিলেতে ডাক্তারি পড়তে গেল, আর দেশে ফিরল না। মেম বিয়ে করে সে দেশেই থেকে গেল। এই নিয়ে শীতল জ্যাঠার আক্ষেপের শেষ ছিল না। বলতেন, ছেলে-মেয়ে খুব মেধাবী, বিদেশে থাকে, এসব কথা শুনতে ভালো, কিন্তু যার ছেলে-মেয়ে এমন মেধাবী হয়, তার ব্যথার খবর কেউ রাখে না।

আচ্ছা, বকুন দাদা এখনো কি বেঁচে আছে? কী অলুক্ষুণে চিন্তা! বেঁচে না থাকার কি হয়েছে? বয়েসে বকুনদাদা তো সরিতশেখরের চাইতেও বছর পাঁচেকের ছোট!

হঠাৎ বকুন দাদার কথা মনে আসাতে একটু লজ্জা পেলেন দ্বিদল। তিনি নিজে কখনো সরিতশেখরকে বকুন দাদার কথা না বললেও সরিতশেখর কোনোভাবে জেনেছিলেন যে, ওদের বিয়ে হওয়ার কথা হয়েছিল। তাই নিয়ে প্রথম দিকে সরিতের সন্দেহের শেষ ছিল না। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, বকুন দাদার সঙ্গে কখনো দ্বিদলের কথা হয়েছিল কিনা, বকুন দাদা দেখতে সরিতের চাইতে সুন্দর কিনা, ইত্যাদি।

দ্বিদল বকুন দাদার প্রসঙ্গ উঠলেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতেন। শীতল জ্যাঠা তার সঙ্গে দ্বিদলের বিয়ে দেবেন ঠিক করে রেখেছেন, তা কি জানতো না বকুন দাদা! তা হলে ম্যাট্রিক পাশ করার পর ওর বই-খাতাগুলো ঘটা করে দ্বিদলকে দিয়ে দেয়ার কি দরকার ছিল? আদিখ্যেতা? তাকে বাতিল করে বকুন দাদা শেষমেশ এক ফ্যাটফেটে মেম বিয়ে করেছে, এটা যে দ্বিদলের পক্ষে কতখানি অসম্মানের, সরিতশেখর তা বুঝবেন কী করে! তিনি তো পুরো বিষয়টা একজন পুরুষের চোখ দিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন। দ্বিদলের অন্তরের ক্ষতটা তাই ওর চোখে পড়েনি কখনো।

--একটু দুধ কিংবা ফলের রস কি খাওয়ানো যাবে?

--স্যালাইন চলছে, এখন বাইরের খাবার খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। তাছাড়া উনি এখন খেতেও পারবেন না।

কথাগুলো অস্পষ্ট, কারা বলছে, কার উদ্দেশে বলছে, কিছুই ধরতে পারছেন না দ্বিদল। তিনি শুধু দেখতে পাচ্ছেন, পেঁজা তুলোর মত রাশি রাশি মেঘ নীল আকাশে ভেসে যাচ্ছে। ফ্রক-পরা দ্বিদল সেগুলোর একটার মাথা থেকে আরেকটার মাথায় লাফিয়ে লাফিয়ে চু-কিতকিত খেলার ঘর কিনে যাচ্ছেন। আর পাশ থেকে

হনুমতী চেঁচিয়ে বলছে, এই তোর দাগে পা পড়েছে, পচা, পচা!

দ্বিদলের ছোটবেলার খেলার সঙ্গী হনুমতীর আসল নাম ছিল বুলু। মেয়েটার মাথায় একদম চুল ছিল না বলে সবাই ওকে নেড়েমুন্ডি বলে খেপাত। একবার খেলার সময় একটা হনুমান বুলুকে কোলে নিয়ে মজুমদারদের গাব গাছের মগডালে উঠে পড়েছিল। তারপর সে কি কান্নাকাটি, চেঁচামেচি, অনুনয়-বিনয়! হনুমান কি আর মানুষের ভাষা বোঝে! জেলেপাড়ার মালোরা এসে গাব গাছের তলায় জাল বিছিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, পাছে বুলুকে গাব গাছ থেকে হনুমান ফেলে দেয়! কিন্তু কোন কিছুতেই কাজ হচ্ছিল না। না হনু মহারাজ নিচে নামেন, না বুলুকে ছেড়ে দেন! শেষে জয়নারায়ণের মান্দের আব্বাস কোত্থেকে এক কাঁদি পাকা কলা গাবতলায় নামিয়ে রেখে সকলকে সরে যেতে বললো। কলা দেখে কিছুক্ষণ বাদে হনু মহারাজ নিচে নেমে এলেন। বুলুকে মাটিতে নামিয়ে রেখে কলার কাঁদি নিয়ে আবার গাব গাছের মগডালে চড়ে বসলেন! সেই থেকে বুলুর নাম হয়ে গেল হনুমতী! তবে সামনাসামনি বললেই ক্ষেপে গিয়ে বাপ-মা তুলে গালাগাল করতো। ঝগড়ায় বুলুর খুব নামডাক হয়েছিল।

-ডাক্তারবাবু, পেশেন্টের অবস্থা কেমন বুঝছেন?

- আটচল্লিশ ঘন্টা না গেলে কিছু-

দ্বিদলের খুব মজা লাগছিল। শীতলজ্যাঠা মনে হয় হনুমতীকে ইঞ্জেকশান দিচ্ছেন। হনুমানের কোলে চড়ে ভয়ে বেচারা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে! কিন্তু পেশেন্টের কথা কে জিজ্ঞেস করছে? বুলুর বাবা হেমাঙ্গ কাকা? কিন্তু সে তো কখনো স্কুলের ছায়া পর্যন্ত মাড়ায়নি। আজীবন জয়নারায়ণের জমি-জিরেত দেখাশোনা করে এসেছে। তাঁর তো 'পেশেন্ট' শব্দটা জানার কথা নয়! ভাবতে ভাবতে দ্বিদলবাসিনী আবার মেঘের মধ্যে তলিয়ে গেলেন।

তিন

'মা, মা' করে কে যেন অনেকক্ষণ ধরে ডাকছে। ধড়মড় করে উঠতে গিয়ে দ্বিদলের মনে হল, তিনি যেন একটা বিরাট গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন। অন্তহীন অতল কৃষ্ণগহ্বর। পতন আটকাবার জন্যে তিনি হ্যাঁচোড়প্যাঁচোড় করে কিছু একটা ধরার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু হাতের কাছে কিছুই পেলেন না। ভয়ে দ্বিদল চিৎকার করে উঠতে চাইলেন। কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। তাঁর সারা শরীর ঘামে ভিজে উঠল। মাথার মধ্যে সুতীব্র যন্ত্রণার একটা স্রোত নেমে এসে তাঁর স্বপ্নের জাল কেটে এলোমেলো করে দিতে লাগলো।

হঠাৎ কারা যেন ছোটাছুটি শুরু করে দিল। কয়েকটা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর এলোমেলোভাবে চিৎকার জুড়ে দিল, নার্স, দেখুন, পেশেন্টের হাত থেকে স্যালাইনের নিডল খুলে গেছে। ডাক্তার, ডাক্তার! শিগগির ডাক্তারবাবুকে ডাকুন। পেশেন্ট খুব আনরেস্ট হয়ে উঠেছে!

হাসি পেল দ্বিদলের। সাগরদাঁড়ির বাইতিপাড়ার ললিত বাইতির ছেলে জগন্নাথ যশোরের কলেজে পড়তে গিয়েছিল। এই নিয়ে বামুন-কায়েতদের ঈর্ষার শেষ ছিল না। গ্রামে ভদ্দরলোকদের বেশিরভাগ ছেলেই যেখানে স্কুলের গন্ডি পেরোতে পারে না, সেখানে বাইতির ছেলে গেছে কলেজে পড়তে! সুযোগ পেলেই সকলে নানাভাবে ললিত বাইতিকে হেনস্থা করার চেষ্টা করতো। বাপ যার গামছা পরে দিন-রাত বাঁশ-কঞ্চি দিয়ে ঝুড়ি বোনে আর কপোতক্ষের ঝিনুক পুড়িয়ে চুন তৈরি করে, তার ছেলে কিনা কলেজে পড়তে যায়! শেষে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে ললিতের ধোপা-নাপিত বন্ধ হয়ে গেল। তাতেও অবশ্য ললিতকে খুব একটা দমানো গেল না। কারণ যে দিন-রাত গামছা পরেই কাটায়, ধোপাকে তার এমনিতেই দরকার হয় না। খেউরি করার দরকার পড়লে হাটবারে মাগুরগোনার হাটে গেলেই কাজ চলে যায়!

সে সময়ে সবে বিয়ের পর দ্বিদল সাগরদাঁড়ি এসেছেন। বাড়ির সামনে বিরাট পুকুর, সেটির পাড়-ঘেঁষা ডিসট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা। একদিন সকালে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে দেখলেন, একদল লোক রাস্তা দিয়ে একটা

ছেলেকে ধরে নিয়ে আসছে। ছেলেটার পরনে চোঙা প্যান্ট, পায়ে জুতো-মোজা। লোকগুলো ওকে শাসাতে লাগল, অ্যা! বাইতির ছেলের শখ হয়েছে জুতো-মোজা পরার। শালা খোল বলছি! এই ন্যাড়া, টেনে ওর প্যান্টটা খুলে দে তো! দাঁড়িয়ে দেখছিস কী হাঁ করে? পা'র থেকে জুতো-মোজা খোল আগে!

ওরা দাঁড়িয়ে থেকে ছেলেটার পা থেকে জুতো-মোজা খোলাল। তারপর হুকুম হল নিজের হাতে জুতোজোড়া জলে ছুঁড়ে ফেলার।

ছেলেটা দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। মাতব্বরদের হুকুম তামিল হচ্ছে না দেখা আস্তে আস্তে লোকগুলো অধৈর্য হয়ে অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করল। কিন্তু তাতেও কাজ হল না দেখে ওরা ছেলেটাকে এলোপাতাড়ি মারতে শুরু করল। কিছুটা মার হজম করার পর এক সময়ে বাধ্য হয়ে সে জুতোজোড়া জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তারপর ওদের কথামত মোজার মধ্যে মাটির ঢেলা ভরে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

গলা পর্যন্ত জলে ডুবে দ্বিদল সেই নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখতে দেখতে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

একজন বললো, পুকুরে মেয়েছেলে রয়েছে বলে তোর প্যান্টটা আজ খুললাম না। এরপর থেকে তোরে যেন কখনো এসব প্যান্ট-জুতো পরে ঘুরতি না দেখি। বাপের পোঁদে ত্যানা জোটে না, ছেলের পুঙায় চুঙা প্যান্ট! সাহস কত!

লোকগুলো মহা উল্লাসে চিৎকার করতে করতে ফিরে গেল। দ্বিদলের বুঝতে অসুবিধা হল না যে ছেলেটা ললিত বাইতির ছেলে জগন্নাথ।

এই ঘটনার কিছুদিন পর জগন্নাথ পাগল হয়ে গেল। একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। উলঙ্গ হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াত আর নিজের মনে বিড় বিড় করে বলত, সোস্যাল আনরেস্ট ব্রিংস কালচারাল রেভোলিউশান, সোস্যাল আনরেস্ট-

'আনরেস্ট' শব্দটা কানে যেতে দ্বিদলের মনে হল, উলঙ্গ জগন্নাথ বুঝি আশেপাশে কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে।

-দাদা, তুমি এসে পড়েছো, ভালোই হয়েছে! মা'র অবস্থা তো দেখছো। আবার একটা স্ট্রোক হয়ে গেল। তুমি থাকতে থাকতে সম্পত্তি আর মা'র গয়নাগাঁটিগুলোর একটা বন্দোবস্ত করা দরকার। পরে সম্পত্তি নিয়ে ভায়ে ভায়ে লাঠালাঠি করে লোক হাসানোর চাইতে সময় থাকতে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেওয়াই তো ভালো! তাছাড়া বাবা তো আর একা থাকতে পারবে না। সে কোথায় কার কাছে থাকবে সেটাও ঠিক করে নিতে হবে।

মদ্দা হাঁসের মত ফ্যাসফেসে গলা। দাদা বলে কে কাকে ডাকছে? তবে কি বিতান এলো? দ্বিদল-সরিতের ছেলেদের মধ্যে বিতান সবচাইতে প্রতিষ্ঠিত। সরকারি অফিসার, এখন জিলা পরিষদে আছে। বড় বৌমা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের টিচার। সোমপ্রকাশ সবে কন্ট্রাক্টরি শুরু করেছে, ঘাঁতঘোত তখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। বেশ কিছুদিন আগে জিলা পরিষদে টেন্ডার জমা দিতে গিয়ে সে দাদার সঙ্গে দেখা করেছিল। তাতে নাকি বিতানের খুব অসম্মান হয়েছে। অত বড় সাহেবের ভাই কিনা পাতি কন্ট্রাক্টর! জানাজানি হলে লোকে তো ছিছি করবেই, তাঁর উপর নাকি সবাই বলবে, সাহেব পক্ষপাতিত্ব করে ভাইকে কাজ পাইয়ে দিয়েছে! বড় বৌমা এসে ঘটা করে শ্বশুর-শাশুড়িকে এই নিয়ে অনেক কথা শুনিয়ে গিয়েছিল। তবে কিছুদিন পরে তার চাইতেও মজার খবর এনেছিল সোমপ্রকাশ। সব চাইতে কম দর দেওয়া সত্ত্বেও কী সব টেকনিক্যাল কারণে জিলা পরিষদে ওর টেন্ডার বাতিল হয়ে গেছে। আর টেন্ডার কমিটির রেজোলিউশানে নাকি বড়ো সাহেবই জোর করে সেই টেকনিক্যাল ত্রুটিগুলো লিখতে বাধ্য করেছিলেন।

সোমপ্রাকাশ হাসতে হাসতে বলেছিল, জানো মা, মোড়ে মোড়ে বিজ্ঞাপনের মত দাদা আসলে

সততার প্রতিমূর্তি হতে চায়! সে জন্যেই হয়তো এই অসততা!

কোথায় যেন প্যাঁক প্যাঁক করে শব্দ হচ্ছে।

দ্বিদল দেখছেন, বড়দা এসেছে সাগরদাঁড়ি। বছর পাঁচেকের বিতান সারাক্ষণ মামার সঙ্গে লেপ্টে আছে। বড়দা ফিরে যাওয়ার সময় বিতানের সে কী আছাড়ি-বিছাড়ি কান্না! মামাকে সে কিছুতেই যেতে দেবে না। মালোপাড়ার কানাই মালো বিতানের সেই কান্না দেখে ওকে একটা হাঁসের বাচ্চা দিয়েছিল। চোখে-জল মুখে-হাসি বিতান হাঁসের বাচ্চা পেয়ে খুব খুশি। কী সুন্দর দেখতে সেই বাচ্চা হাঁসটাকে! সারা গায়ে সোনালি রোম, ঠোঁট আর পা দুটো লালচে গোলাপি। সারাক্ষণ সেটি বিতানের পায়ে পায়ে ঘোরে। এমনকী পুকুরে ছেড়ে দিলেও বিতানের গলার আওয়াজ পেলেই সে জল থেকে উঠে আসে। দ্বিদলের হঠাৎ মনে হল, বিতানের সেই হাঁসটাকে বুঝি পুকুর পাড়ে শেয়ালে ধরেছে। পুকুরের ওপারে বারুইদের পানের বরজে শেয়ালের বাসা। শেয়ালের মুখে ঝুলতে থাকা সেই হাঁস যেন দীর্ঘ বিলম্বিত প্যাঁক প্যাঁক আর্তনাদ করছে। দ্বিদল বার কয়েক বিতানের নাম ধরে ডাকার চেষ্টা করলেন, কিন্তু জিহ্বা সাড়া দিল না। অসহায় দ্বিদল দেখলেন, হাঁসের বাচ্চাটার গলা থেকে চুইয়ে আসা ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বাঁশতলায় ঝরা পাতার ওপর বীভৎস আলপনা এঁকে চলেছে। ভয়ে, উত্তেজনায় দ্বিদল দর দর করে ঘামতে লাগলেন।

চার

-আচ্ছা, দমদমের বাড়িটা তো মা'র নামে, তাই না?

-ঠিক জানি না। দলিলটা দেখলেই বোঝা যাবে।

-দলিল চাইলে দেবে ভাবছঝ? বাবাকে চেনো না?

-চিনি তো। সেই জন্যেই তো বি এল আর ও অফিস থেকে পড়চা বের করতে দিয়েছি। যদি দেখি বাড়িটা মায়ের নামে, তাহলে একখানা দলিল তৈরি করে এনে কেউ যখন থাকবে না, মা'র হাতের টিপছাপ নিয়ে নিতে হবে।

-আর যদি বাবার নামে হয়?

-তাহলে বাবাকে পটিয়ে-পাটিয়ে আপাতত আমাদের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখতে হবে। তারপর সুযোগমতো-

-ইল্লি আর কী! ওসব আমি পারব না। তোমার বাবার সঙ্গে একত্রে থাকা কি সহজ নাকি? আস্ত গাঁইয়া, তার ওপর হিটলারি মেজাজ! ওসব ঝক্কি আমি পোয়াতে পারব না, এই সাফ বলে রাখছি!

-না পারলে দমদমের অত বড় বাড়িটা ফস্কে যাবে! বাড়িটার এখন ভ্যালুয়েশান কত জানো?

-আচ্ছা, সে দেখা যাবে। তুমি কি জানো, স্বপ্নময় এসে রাজ্যের পেতল-কাঁসা বস্তায় ভরে ওর শ্বশুর বাড়িতে চালান করে দিয়েছে! বাবার তো আবার স্বপ্নময়ের উপর বেশি টান। কে জানে, এর মধ্যে হয়তো বাবাকে পটিয়ে মায়ের গয়নাগাঁটিগুলোও হস্তগত করেছে। বাবা ভাবছে, স্বপ্নময় ওনাকে শিলিগুড়ি নিয়ে গিয়ে রাজার হালে রাখবে! উনি তো আর ছোট বৌটিকে চেনেন না, সে কী চিজ! সেদিন সামান্য একটা হার নিয়ে কত কথাই না বলল! আমি কি হারটা নিয়ে খেয়ে ফেলেছিলাম? আর যদি নিয়েই থাকি, অন্যায়টা কী করেছি? আমার হকের জিনিস আমি নিয়েচি, তাতে কার বাপের কী?

-আ! চুপ কর না!। কে যেন আসছে?

-মেজদা যে, মেজ বৌদিও আছে দেখছি! দোকান কি বন্ধ রেখে এলে? নাকি অভয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে এসেছ? ও কিন্তু ভয়ানক চোর।

- জানি রে ভাই। কিন্তু মা আগে, না দোকান আগে? তাছাড়া আজ আবার ডাক্তার নিয়োগীর বসবার কথা। সকাল থেকে পেশেন্টরা নাম লিখিয়ে রেখেছে-

দ্বিদলের বেশ লাগছে নাটকটা শুনতে। সংসারের সব কাজ সেরে রোববার এই সময়টার জন্যে অপেক্ষা করেন দ্বিদল। কিন্তু এখন মনে করতে পারছেন না, সংসারের সব কাজ সারা হয়েছে কিনা। বিবিধ ভারতীতে বোরোলীনের সংসার দ্বিদলের প্রিয় অনুষ্ঠান। তবে আজকের নাটকটা যেন খুব চেনা চেনা লাগছে। আগেও হয়ত দু-একবার শুনেছেন। ওরা মাঝে মাঝে পুরনো নাটক পুনঃপ্রচার করে।

--কেমন আছ দ্বিদল?

গলাটা যেন খুব চেনা চেনা লাগছে। দ্বিদল আবার চোখ খোলার চেষ্টা করলেন। সরিতশেখর এলো কি? কিন্তু এতদিনের দাম্পত্য জীবনে সরিতশেখর তো কখনো এমন নাটকীয়ভাবে সে কেমন আছে, জানতে চায়নি! তা ছাড়া সে তো দ্বিদলকে নাম ধরেও ডাকেনি কখনো! তবে কি--?

পূর্ব পাকিস্তানে তখন চরম গোলমাল শুরু হয়েছে। একদিকে আওয়ামি লিগের শেখ মুজিবর রহমান সমস্ত বাঙালির হয়ে লড়ছেন, অন্যদিকে ইয়াহিয়া খানের সামরিক দমন-পীড়ন। হিন্দুরা জলের দরে জমিজমা বাড়িঘর বিক্রি করে হিন্দুস্থানে চলে যাচ্ছে। চারিদিকে যুদ্ধের দামামা বাজছে। নির্বাচনে আওয়ামি লিগের বিপুল জয়ের পরেও ক্ষমতা হস্তান্তর হয়নি। মাঝে মাঝে রেডিওতে মুজিবরের সেই অবিস্মরণীয় ভাষণ, 'এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম' ভেসে আসছে। সারা দেশ তোলপাড় মুজিবের সেই আবেগময় উদাত্ত কণ্ঠস্বরে। সংখ্যালঘু হিন্দুরা তবু ভরসা করতে পারছে না। বিশেষত একটু সম্পন্ন বর্ণ-হিন্দুরা। সবাই জলের দরে জমি-বাড়ি বিক্রি করতে চাইছে, তবু ক্রেতা নেই। দূরদর্শী জয়নারায়ণ স্থির প্রতিজ্ঞ, যা থাকে কপালে, পূর্ব পাকিস্তানে আর থাকা নয়। বড়দা বনগাঁতে এক মুসলমান পরিবারের সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময়ের কথা প্রায় পাকা করে ফেলেছে।

সরিতশেখর অবশ্য বরাবরই দেশ ছাড়ার ঘোর বিরোধী। কিন্তু শ্বশুরমশাই সপরিবারে দেশ ছাড়ছেন শুনে দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেল। দ্বিদলকে কয়েকদিনের জন্যে মোবারকপুরে রেখে গোপনে হিন্দুস্থানে গেল। উদ্দেশ্যটা অবশ্য একমাত্র দ্বিদলই জানত। ওদেশে একটু জমি কিংবা বাড়ি কিনে রাখা। নিতান্তই যদি দেশ ছাড়তে হয়, অন্তত একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই করে রাখা ভাল।

সেই উত্তাল সময়ের মধ্যে আচমকা শীতল ডাক্তার মারা গেলেন। খবর পেয়ে কয়েকদিন পরে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বকুনদাদা এসেছিল। একা। একেবারে পাকা সাহেব।

জয়নারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে এসে একান্ত দ্বিদলকে বলেছিল, তোমাকে বিয়ে না করাটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল, দ্বিদল।

বকুনদাদার সেই নিভৃত খেদোক্তি, একটিমাত্র বাক্য, জীবনে একবারই বকুনদাদার সঙ্গে মুখোমুখি কথা। দ্বিদল মুখ তুলে চাইতে পারেননি, কোনো কথাও বলতে পারেন নি।

কেউ যেন আলগোছে দ্বিদলের কপালে হাত রাখল। খুব পরিচিত সেই স্পর্শ, তবুও তিনি মানুষটাকে মনে করতে পারলেন না।

হঠাৎ ওঁর মনে হল, যেন একটা প্রবল ঝড় উঠেছে। গাছপালা, বাড়িঘর, সব যেন সেই প্রবল ঝড়ের দাপটে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে সামাল সামাল রব। তাঁর শরীরটাও যেন ঝড়ের ঘূর্ণিতে ঝরা পাতার মতো পাক খেতে লাগল।

এই প্রথম দ্বিদলবাসিনী প্রচন্ড ভয় পেলেন। তিনি প্রাণপণে চিৎকার করে উঠতে চাইলেন। বলতে চাইলেন, কে কোথায় আছ, আমাকে ধরো, আমাকে ধরো।

কিন্তু গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বের হল না।

দ্বিদল মরিয়ার মত কপালে রাখা হাতখানা চেপে ধরে সেই স্বপ্নের উড়ান আটকানোর চেষ্টা করে চললেন। তাঁর লুপ্তপ্রায় চেতনায় একটা আবছা মুখ ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দুলতে দুলতে স্থির হয়ে এলো, অথচ দ্বিদলবাসিনী ধরতে পারলেন না, মুখটা কার।

আস্তে আস্তে মুঠি আলগা হল, নির্ভার শরীরটা যেন পেঁজা তুলোর মতো মেঘের ওপর পা ফেলে এক্কা দোক্কা খেলতে খেলতে এগিয়ে চললো।

স্কোয়ার সেন্টিমিটার

কল্যাণ মৈত্র

বাঁকের মুখেই চোখে পড়ল। শ্রদ্ধা দাঁড়িয়ে। মুখের ডান দিক ছুঁয়ে গলা থেকে বুক দিয়ে জানুয়ারির দুপুরের শীতের রোদ নেমে গেছে পায়ের পাতায়। হঠাৎ দেখলে মনে হবে আইসক্রিমের মতো চামচ দিয়ে কেউ ওর শরীর থেকে কিছুটা ছায়া অংশ কেটে নিয়েছে। জমাট ঘাসের সবুজ মাঠটা একটা

আইসক্রিম কাপ বা একটা ডিশ। শ্রদ্ধা চাড্ডা উন্মুখ দাঁড়িয়ে। শীতের দুপুর, রোদ তেমন কড়া নয়, তবু দেখা গেল শ্রদ্ধা ঘামছে। পাকা ধানের মতো গায়ের রং। মসৃণ ত্বক। একমাথা কাজল-কালো ঘন চুল। রোদের আভায় মুখের ওপর, কপালের ওপর ঘামের বিন্দুগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

লেখক - কল্যাণ মৈত্র

শ্রদ্ধা চাড্ডা, পঁচিশ বছরে 'স্কোয়ার সেন্টিমিটার' অ্যাডভ্যারটাইজিং এজেন্সির কলকাতা ও নর্থ ইস্টের মার্কেটিং হেড। চোস্ত ইংরেজি বলে, এমবিএ। বেঙ্গালুরু ও মুম্বাইতে কিছু সময় কাজ করেছে ও। এর আগে কিছু দিন আমাদের মিডিয়া হাউসে অ্যাড অ্যান্ড মার্কেটিং-এ প্রবেশনে ছিল। মাত্র কয়েক মাস! সেই সূত্রে আমার সঙ্গে পরিচয়। ওর বাবা পাঞ্জাবী এবং আইপিএস। মা উত্তর কলকাতার সাবেকী । বাঙালি জমিদার পরিবারের মেয়ে। জেএনইউ পাশ আউট। অবাঙালি টানে শ্রদ্ধা পরিষ্কার বাংলাও বলতে পারে। আমাকে হন্তদন্ত হয়ে সেমিনার রুমের দিকে আসতে দেখে বলল, সুজিতদা হোয়ার ডিড ইউ গো?...ওয়েটিং ফর আ লং টাইম... উই আর অলরেডি লেট...এডুকেশন মিনিস্টার এসে গেছেন। সেলেবরাও... ডক্টর সেন ইজ ইনফরম্যালি স্পিকিং উইথ দ্য মিডিয়া পিপল...

—প্রেস! ডক্টর সেন... ওরে বাবা... ওরা সবাই এসেছেন?

-ইয়া.. দে অল হ্যাভ কাম। অল দোজ হু আর ইনভাইটেড... অ্যান্ড, আরও বেশ কিছু লোকজন... ডক্টর সেন পারসোন্যালি অনেককে বলেছেন।

ওর পাশে গিয়ে গলার স্বর যথেষ্ট নামিয়ে, বললাম, রানি বোস ভীষণ অসুস্থ কাল সকাল থেকে... আসতে চাইছিলেন না। আমি রিকোয়েস্ট করলাম, ওর হাজবেন্ডকে বোঝালাম। আমার মুখ চেয়ে...

– দ্যাটস গ্রেট। ব্রিলিয়্যান্ট...

—এখন একটু ভালো বোধ করায় শেষ পর্যন্ত বেরিয়েছেন। গাড়িতে আছেন... গাড়ি এখানে এ পর্যন্ত ঢুকবে না... মেলা কমিটির টোটোতে চাপিয়ে তাকে নিয়ে আসছেন সেক্রেটারি। গাড়ি থেকে নামার সময় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল মিস্টার শ্রীদেব চট্টরাজের সঙ্গে। ওকে তো জানো পালটি খেতে ওর জুড়ি নেই। কিছু দিন আগে ছিলেন আগমার্কা আমরা, এখন ওরা-তে। এই সেদিন রানি বোসকে ওরা সবাই মিলে সাহিত্য সংসদ

থেকে গালাগালি করে তাড়ালো, আর দেখো বুকারে নাম উঠতেই নিজেদের পালটে ফেলেছে ... যদি নোবেলটা পান তখন? ... সবই ব্যবসার হিসাব, কৌশলপ্রবণ মন, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে চলতে হয় তাই না?

চট্টোরাজের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর মনে কোথায় যেন একটা ইরিটেশন তৈরি হয়েছিল। সেটা যেন রিলিজড হয়ে গেল নিমেষে। নিমেষে? হবে হয়তো! ইনি সময়ে ট্রেড ইউনিয়ন লিডার, কখনও লেখক, সম্পাদক (ব্যর্থ কেননা তার বই, ম্যাগাজিন কেউ পড়েন না), তিনি স্বঘোষিত সাহিত্যিক। তিনি চিন্তক (চিন্তাবিদ, ইন্টেলেকচুয়াল) তিনি ভাবুক। মানে ভাবেন অনেক কিছু। যাই ভাবুন না কেন তাতে সাহিত্য বা বাঙালির কোনো উন্নতি হয় না। কাগজের সেল বাড়ে না। উলটে লোকে ফেসবুক করে মন দিয়ে। লোকে বই না কিনে মেলায় গিয়ে চিকেনফ্রাই কেন খায়? তা নিয়ে তিনি কিন্তু ভাবতে রাজি নন। ওতে মাথায় বড় চাপ পড়ে। দেশ কাল মানুষ, তার প্রকৃতি, তার চাওয়া পাওয়া, ইচ্ছা অনিচ্ছা, দ্বেষ-বিদ্বেষ, প্রেম প্রীতি, লোভ লালসা, এমনকী মানুষের মিলন, জন্মদান ও খুন করার ধরন ও কারণ— সব কিছু ভীষণভাবে বদলে যাচ্ছে। সুরিয়েলিজমে পড়ে নেই আর কেউ (?), ম্যাজিক রিয়েলিজমেও না। রিয়েলিজমের চাপে মানুষ অতি রিয়েলিস্টিক। এখন ডিপ্রেশনের কাল। জেহাদের কাল। টেরোরিজমের কাল। ডিজিটাল মানুষের নাগাল পাওয়া ভারি মুশকিল এই দুনিয়ায়। তারা ইলেকট্রনিক দুনিয়ার পাঠক। তাদের মনমস্তিষ্কের দরজায় আজকের এই প্রচার সর্বস্ব লেখকরা হাজার কড়া নাড়লেও তা খুলবে না। মন এখন আর তত নরম হয়না একটুতে। সে যে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠছে। সে মাঠও জানে, স্পেসও জানে। মানুষ অভিনবত্ব চায়। নতুন কিছু চায়। সে পায় না। তখন সে পুরোনোতে ফেরে। অতীত পাঠ! আবার সে খোঁজেও নতুন দুনিয়ায় কে নতুন কথা বলছেন দেখি! চট্টরাজ স্বজনপোষণের একটি নামি, এস্টাবলিশড ব্র্যান্ড। ছাইভস্ম যাই লিখুন না কেন ছাপা তো হয়! আর লেখা ছাপলেই তো লেখক! লেখকদের তিনি পুরস্কার দেন টেন। ক্ষমতাটা রেখেছেন নিজেদের হাতে। মিডিওকার লেখকরা তাকে ভয় পান। তাকে সমীহ করে না চললে সাহিত্যে টেকা দায়। তিনি নিয়মিত বিদেশে যান। ফেসবুক করেন। রসেবশে আছেন আগাছা সাহিত্যিকদের দলবল নিয়ে। একটু এগিয়ে বললে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিলিটের ব্যবস্থাটা তিনি করতে পারেন... যদি লাইনে থাকো দাদা...

শ্রদ্ধা বললো, এখানে দাঁড়িয়ে... হোয়াট আর ইউ থিংকিং? শ্যাল উই ওয়েট....

—জাস্ট ওয়েট... রানি বোস এসে পড়লেন বলে... আরে আফটার অল ম্যাগসাইসাই, জ্ঞানপীঠ... শী ইজ রিয়্যালি অ্যা জিনিয়াস... বাঙালির গর্ব।

– দ্যাট আই নো সুজিতদা। মায়ের মুখে শুনেছি। ওঁর লেখা আমি ইংরেজিতে ট্রানস্লেটেড ভার্শানে পড়েছি.. বাট এ লিটিল বিট ইউ নো... ডক্টর সেন বলছিলেন ওঁর স্ট্রাগলের কথা। ওর পুরস্কার পাওয়ার খবর কলকাতার বড় কাগজে ছাপা হয়নি। ভেরি স্যাড!

– খবর? ওর লেখা ছাপতে একদিন ভয় পেতেন কলকাতার এক শ্রেণির সম্পাদক। যারা ছাপতো তাদের চাকরি যেতে পারতো। তার বদলে ওরা আর একজনকে মাথায় তুলছিল।

—ইউ মিন দ্যাট রাইটার, ইন্টারন্যাশনালি ফেমাস নুজাৎ আজিজ? নাউ ফলিং ডাউন...শী ওয়াজ অ্যা রাইটার.. পাওয়ারফুল পারহ্যাভ... নাউ এ স্পিকার , জাস্ট এ স্পিকার....

চট্টরাজ রানি বোসকে নিয়ে তখনই ঢুকলেন সামনের রাস্তাটায়। আমরা এগিয়ে গেলাম। রানি বোস আজ ডক্টর ইন্দ্রনীল সেনের স্ত্রী বাসবদত্তার কবিতার বইয়ের উদ্বোধন করবেন। এসেছেন, বসেও আছেন, শিক্ষামন্ত্রী। প্রকাশক ধরে বাসবদত্তার কবিতার বই ছাপানোর সব ব্যবস্থা বলতে গেলে আমিই করেছি। প্রকাশকের কী ! সে মোটা টাকা পেয়েছে। বিক্রির কোনো দায়িত্ব তার

নেই। ডক্টর সেনের টাকার অভাব নেই। টাকা খরচের দরকারও নেই। নেপথ্যে কেউ না কেউ তা দিয়ে কৃতার্থ হবেন। যেমন আমি, কাগজে রিপোর্টারের চাকরি করি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েও রানি বোসকে রাজি করিয়ে ছিলাম ওই রাবিশ কবিতার বইয়ের ভূমিকা লিখতে। বাসবদত্তা সুন্দরী। ভাল গান গান। তার চর্চা না করে কেন তিনি কবিতা লেখেন বুঝিনি। এই সব কাজ করলে বিপদ বাড়ে... তখন তাদের আশা আরও বিস্তীর্ণ হয়। অনুরোধ রক্ষা করতে না পরলে তুমি পাবে জিরো। না করলে ফঁসি কাঠে গলা... ডক্টর সেন ইজ এ ভেরি পাওয়ারফুল ম্যান ইন দ্য মিডিয়া ইনডাস্ট্রি। একদিন আমাদের হাউসের বিধাতা ছিলেন। সম্প্রতি ছেড়ে গেছেন। তবু সম্পর্কটা ওপরতলার ক্ষমতাঅলাদের সঙ্গে বেশ রয়েছে। তারা ওঁকে তোষামোদ করেন। এই কারণেই মাঝে মধ্যে আমাকে শাস্তি পেতে হয়। এই কাজ করতে হয়। লালকে নীল আর নীলকে লাল বলতে হয়। চার্টার্ড প্লেনে চেপে তিনি ঘোরেন। খুব শার্প , ভাবনা চিন্তায় বেশ খোলামেলা, পড়ুয়া। আমি এমনিতে ওঁকে বেশ মান্য করি। তাই কিছু বললে না বলতে পারি না। তাছাড়া ওই যে আমার ভাগ্যের চাবিটা যে ঝুলছে..

শ্রদ্ধা বলল, ডক্টর সেন একটা অনুরোধ করেছেন। নিজে বলতে পারছেন না। তাই তোমাকে দিয়ে বলাতে চান। তুমি যদি বলে কয়ে রানি বোসকে দিয়ে ওর কবিতার বইটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির মধ্যে ...

– অ্যাবসার্ড! কী ভাবেন ওঁরা নিজেদের ? জীবনানন্দ দাশ নাকি?

– তুমি না বলবে না। বলবে দেখছি , বলে কাটিয়ে দিও। তবে হ্যাঁ, উদ্বোধনের পর কথা বলবে।

কবিতার বইয়ের উদ্বোধন যথারীতি হয়ে গেল। রানি বোস যে এত আপ্লুত হবেন ভাবতে পারিনি। তিনি যা বলা উচিত নয় তাও বললেন। প্রশংসা করলেন কবিতার, লেখিকার। বাসবদত্তার অন্তর্দৃষ্টি আছে। ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। প্রেসের লোকেরা প্রচুর লিখল। মিষ্টির প্যাকেট, গিফ্ট বগলদাবা করে তারা চলে গেল।

শ্রদ্ধা চাড্ডা বললো, ওয়েট করতে হবে আমাদের। বাসবদত্তা একটা চেক দেবেন।

- কীসের চেক ?

– কাল চারটে কাগজে এই রিপোর্ট, ছবি-সহ ছাপা হবে। তার জন্য আলাদা লোক আনা হয়েছে। তারা লিখবে, কাগজগুলো টাকা নিয়ে তা ছাপবে। রানি বোস যে বাসবদত্তার বই ইনঅ্যাগুরেট করলেন! ইটস্ এ বিগ নিউজ—এটা প্রমাণ করতে হবে।

– মাই গড! সে তো অনেক টাকা!

– তাতে তোমার কী ? আমার এজেন্সি পেল, কাগজগুলো পেল... এটা আমাদের কাজ।

এই বলে শ্রদ্ধা কুর্তির ওপর ওড়নাটাকে ভাল করে জড়িয়ে নিল। যেন ও নিজের শরীর ঢাকার জন্য কত সতর্ক। আমি ওর নিচে কী আছে জানি। আন্দামানে জলি আইল্যান্ডে ও সুইমস্যুট পরে জলে নেমে ছিল। আমি দেখেছি। অবাক হয়েছি। মনে রাখার মতো সুন্দরী। পিঠের জরুলটাকে যেন আবার দেখলাম। স্মৃতি!

রানি বোসকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে। আমার দায়িত্ব। গাড়িতে উঠলাম। সঙ্গে শ্রদ্ধা চাড্ডা। গাড়ি সবে স্টার্ট দিয়েছে। কিন্তু মুহূর্তে কত কী ঘটে গেল। শ্রদ্ধার পাশে বসে ছিলেন রানি। হঠাৎ গড়িয়ে পড়লেন। মুখ দিয়ে জেলা বেরোচ্ছে। প্রায় অচৈতন্য অবস্থা। কী করব? সবাই যে চলে গেছে। জল দিলাম রানি বোসের মুখে চোখে। সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বিকাল শেষ প্রায়। অন্ধকার নামছে। শ্রদ্ধা নির্মম দৃষ্টিতে বললো—ইজ শী ডেড ?

আমার যেন সারা শরীরে কে হিম প্রবাহ চালিয়ে দিল। আতঙ্কিত, বিহ্বল। চকিতে নেমে পুলিশকে ডাকলাম। ঘটনাচক্রে সেখানে এসিপি রাঙ্কের একজন অফিসার ছিলেন। আমি যে দায়ী হয়ে যাব। উনি মারা গেলে কত বড় খবর হবে আজ। চ্যানেলে চ্যানেলে দেখাবে। সকলে বলবে আমার জন্য! তোমার জন্য... তোমার জন্য ... কী দরকার ছিল অসুস্থ মানুষটাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ... আমি তখন ভিলেন এক...

শ্রদ্ধা এবার বললো, তুমি যাও সুজিতদা। আমাকে এখুনি যেতে হবে। আমি আর থাকতে পারবো না। কালকে রিলিজ আছে। কয়েক হাজার স্কোয়ার সেন্টিমিটার...
শ্রদ্ধা থাকলে আমার সুবিধা হতো। ও চলে গেল। রানি বোসের মাথাটা বুকে নিয়ে আমি ভয়ে তখন কাঁপছি।

বাইপাস দিয়ে গাড়ি ছুটছে তীব্র গতিতে। নির্লজ্জের মতো রানি বোসের ব্যাগ খুলে দেখলাম— পেয়েছি। মোবাইল। বাড়িতে খবর দিলাম। কেউ নেই। ড্রাইভার ছেলেটি বললো, স্যার সামনে যে হসপিটাল পাব ঢুকে যাব।

আমি ও সেই ড্রাইভার হাসপাতালে। রানি বোস তখন এমার্জেন্সিতে ভর্তি। হাসপাতাল টাকা চায়, বললাম, রিপোর্টার। কাকে এনেছি জানেন তো? চিফ মিনিস্টারকে ফোন করছি... আগে চিকিৎসা শুরু করুন। কে যে তখন আমায় এই সাহস দিল। ড্রাইভার ? সে আসার সময় প্রেস প্রেস বলে রাস্তা করে নিচ্ছিল। আর সেই পুলিশ অফিসারটি। কত বার যে ফোন করেছিলেন। তারপর ...

—ডক্টর সেন.... রানি বোসের মাসিভ হার্ট অ্যাটাক...

– ও মাই গড! ভর্তি করিয়েছ তো? কোথায়? আমরা এখন হোটেলে ফিরছি। কাল ভোরে ফ্লাইট..

—দত্তাদি রানি বোস ইজ ইন অ্যা সিরিয়াস কনডিশন...

– ও মাই গড!

– মিস্টার চট্টরাজ...

– আমি একটা জরুরি মিটিং-এ আছি। পরে ফোন করি...

রাত তিনটের সময় রানি বোসের মাতাল ছেলে এসে বললো, সরি দেরি করে ফেলেছি। জানেন তো বাবা মানসিকভাবে অসুস্থ। একটু আগে বললো, মায়ের ... ও বাই দি বাই, মিডিয়াকে খবরটা দিয়েছেন কি? সকলে জানতে পারতো। আফটার অল শী ইজ এ পাবলিক প্রপার্টি।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ড্রাইভার ছেলেটি বেশ রাগের মাথায় বলল, না।

আলাপী মন ওয়েবের প্রকাশিত বই

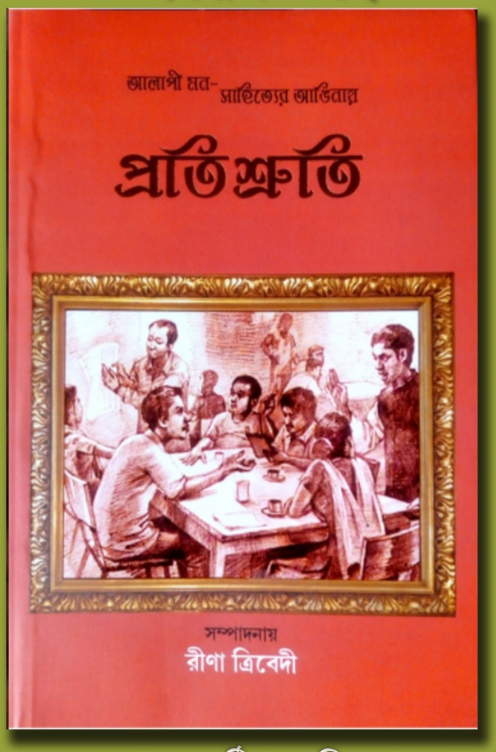

প্রকাশক অক্ষর কুঠি পাবলিকেশন
সম্পাদনায়- রীণা ত্রিবেদী
মুল্য-২০০/-
পাওয়া যাবে কলেজ স্ট্রীটের বিভিন্ন বইয়ের দোকানে- ধ্যানবিন্দু, পাতিরাম, বলাকা বুক স্টল, আদি নাথ ব্রাদার্স , আদি দে বুক স্টল প্রভৃতি। এছাড়াও যোগাযোগ করুন
বুক ডিলার (সাহেব) ৮২৪০০০৪৩২০

রাজার আইন, আদালত, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট সমস্ত মাথার উপর থাকিলেও দরিদ্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিঃশব্দে মরিতে হইবে।

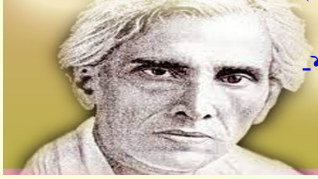

-শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হুল

রীণা চ্যাটার্জী

-উফ্, ছুটির দিনে সকালে যে একটু ঘুমোবো, এখানে এলে তার আর উপায় নেই। ধুস.. বিরক্তিতে কানে বালিশটা চেপে ধরলো ঋষভ।

-কেন? তোমার তো সুখই সুখ, অসুবিধা কিসের! সকালে উঠে বাজারেও আজ যেতে হবে না। ঘুমোও বালিশে পড়ে পড়ে.. আত্রেয়ী ঘুম চোখে বলে ওঠে।

-ঘুমোতে দিলে তো! সকাল থেকেই যা শুরু করে..সকাল বেলায় চীৎকার করে হনুমান চল্লিশা হলো, এবার হনুমানের মতো লাফালাফি চলবে এখন।

-এই শোনো অসভ্যের মতো কথা বলো না। চীৎকার করে হনুমান চল্লিশা হলো মানেটা কি? হনুমানের মতো মানে? হনুমান কাকে বলছো তুমি! ঘুম চোখ রক্তচক্ষু করে উঠে বসে আত্রেয়ী।

-বোঝো ঠ্যালা এবার! এতোক্ষণ বাইরে ছিল এবারে ঘরেও শুরু হলো। অমন নাহলে কি আর এমন হয়! ফিসফিস করে বলে ঋষভ..

-কি বলতে চাইছো কি? মুখে যা আসছে বলে যাচ্ছো! ভদ্রলোক তো কোনোকালেই ছিলে না.. মুখোশ পড়ে ঘুরতে। ওটাও কি খুলে ফেললে? যেমন শ্রী তেমন চাঁদ..যেমন মা, তার তেমন ছেলে।

-এইইই, তুমি আমার মা'কে এর মধ্যে আনছো কেন শুনি? ঋষভ উঠে বসে উস্কোখুস্কো চুলের মাথাটা বালিশ থেকে টেনে তুলে।

-তুমি আমার বাবাকে বলবে, আমাকে বলবে- আর নিজের বেলায় শুনবে না তা তো হয় না। তোমার মা সকাল-সন্ধ্যা গান বাজিয়ে গুরুবন্দনায় যখন বাড়ি মাতিয়ে তোলেন, তখন তো কানে লাগে না! সারাদিন পর অফিস থেকে ফিরে একটু যে শান্তিতে বিশ্রাম নেবো, তার উপায় নেই। ধূপ-ধুনো- আওয়াজে নরক গুলজার করে তুলবেন সন্ধ্যা বেলা। সকালেও এক-রোজ রোজ কাজের তাড়াহুড়োর মাঝে একজন ভক্তিরসে আর একজন নিদ্রারসে ডুবে। একটা দিন শান্তি নেই! অসহ্য..জাস্ট অসহ্য। দু'হাত দিয়ে কপালের রগ দুটো চেপে ধরে আত্রেয়ী। হাওয়া বেশ গরম হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারলো ঋষভ। 'হনুমান' উচ্চারণে যে শ্বশুর নন্দিনী এই রূপ ধরবে মনে হয় ভাবতে পারে নি। ওদিকে রান্নাঘর থেকে কচুরি ভাজার গন্ধ আসছে। ঘরের ঝামেলা বাইরে গেলে কচুরির মজাটাই মাঠে মারা যাবে। তারপর

দুপুরে বাগদা, খাসি সব, সব..জামাই আদর মাথায় তুলে দিতে পারে আত্রেয়ী। 'বোবার শত্রু নেই' এই প্রবচনে গা ভাসিয়ে বালিশে মাথা দিয়ে শাশুড়ি মায়ের স্নেহের ডাকের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে পড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিল ঋষভ।

আত্রেয়ী রাগের চোটে চুলটা ভালো করে পেঁচিয়ে ঘাড়ের ওপর তুলে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। বেরোনোর আগে ঋষভের উদ্দেশ্যে একটি অগ্নিদৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বাপ্ রে! মিলিটারী বাপের মিলিটারী মেয়ে। তবে জলে নেমে কুমীরের সাথে বিবাদ করার মতো বোকা ঋষভ নয়। সেও এই সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দরজা খুলে বেরিয়ে সোজা রান্নাঘরের দিকে এগোলো। স্নেহময়ী শাশুড়ি মা'র সামনে আত্রেয়ীর রোষানলের হাত থেকে অন্তত রেহাই পাওয়া যাবে।

লেখক- রীণা চ্যাটার্জী

রান্নাঘরের সামনে আসতেই হাসিমুখ শাশুড়ি মায়ের, ঘুম ভাঙলো বাবা..অবশ্য এ বাড়িতে সকাল থেকে যা শুরু হয়! ঘুমোতে দিলে তো?

-না না আমার কোনো অসুবিধা হয় নি, ঘুম হয়েছে।

-একটু বসো বাবা, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। মিঠু জামাইবাবুর জন্য চায়ের জল বসিয়ে দে। সকালে ফাঁকা মাঠে প্রথম গোলটা দিয়েই ঋষভ ছাদের দিকে পা বাড়ালো। ওইখানে আরো এক গিঁট- ওইটা সামলাতে পারলে আজকের মতো..

তখনো চলছে শরীর চর্চা, সাথে ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের শব্দ, পাশে ছোটো টেবিলে ঢাকা দিয়ে রাখা লেবুর সরবৎ। জামাইকে দেখেই হাত-পা থামিয়ে বলে উঠলেন- গুড মর্নিং ব্রাদার। এই এক দোষ ভদ্রলোকের সবাইকেই 'ব্রাদার' বলা। তবে এই বয়সেও ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য যে কোনো যুবকের কাছে ঈর্ষণীয়।

ঋষভের 'গুড মর্ণিং' শুনতে শুনতে ওনার লেবুর সরবৎ খাওয়া শেষ। মিঠু ছাদে আসে চায়ের কাপ হাতে। ঋষভের কাপের দিকে একবার চোখ দিয়েই তারপর ঋষভের কাঁধে হাত রেখে সিঁড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। নামতে নামতে বললেন, এখনকার প্রজন্মের একটি বাজে অভ্যাস। বেড-টী, ওইটি নাহলে না কি দিন শুরু হয় না। এটাও ওনার এক স্বভাব- এই প্রজন্মের সবকিছুতেই দোষ দেখা। ঋষভ সবটাই হাসিমুখে ডিফেন্স করে- গোল দিতে না পারলেও গোল খাওয়া যাবে না।

কোনোরকমে একবার দিনটা ভালো করে শুরু হলেই হলো, তখন পুরো খেলা রেফারির হাতে, রেফারি আত্রেয়ীর মা হলেও জামাইয়ের দিকে পক্ষপাতিত্ব একটু বেশিই। তাঁর ছোটোবেলার বান্ধবীর ছেলে। একমাত্র মেয়েকে এমন পরিচিত পরিবারে বিয়ে দিতে পেরে ভীষণ শান্তি- নাহলে যেভাবে বধূহত্যা, আর অত্যাচারের খবর আসে! সব মেয়ের মায়ের রাতের ঘুম চলে যায়। ঋষভের সাথে বিয়েতেও তিনি রেফারি ছিলেন। যতোই ঋষভ তখন আত্রেয়ীর প্রেমে হাবুডুবু খাক, নেহাৎ পরিচয়ের সূত্র ধরে মায়ের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বেরিয়ে এলো। নাহলে এই

মিলিটারী বাপের ওমন জাঁদরেল মেয়ে ঋষভের গলায় মালা কখনোই দিতো না। বাপ-বেটী মিলে ঠিক মাঠের বাইরে পাঠিয়ে ছাড়তো। তবে বাপ-মেয়েকে যে উনি কোন যাদুবলে চুপ করিয়ে দেন, কে জানে!

সিঁড়ি দিয়ে নামতেই সামনে আত্রেয়ী।

-মামণি গুড মর্নিং.. গলায় যত মধু এই একজনের জন্য। ঋষভ এইসবে পাত্তা না দিয়ে চুপচাপ টয়লেটে ঢুকে যায়। সেখান থেকে সোজা খাবার টেবিলে- খালি পেটে আর কতোক্ষণ হাসিমুখ দেখানো যায়!

নিজের হাতে কচুরি-আলুরদম পরিবেশন করতে করতে বলেন- একটা দিনের জন্য আসা। এতে কি আর মন ভরে বলো.. কতবার বলি একটু ছুটি নিয়ে আসতে। একটু যে ভালোমন্দ করবো, তা একদিনে আর কতটুকুই বা..

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আত্রেয়ী বলে ওঠে, তা এই একদিনের 'কতটুকুই' আয়োজনের তালিকাটা একটু শুনি। বাপীকে তো সেই সকালে উঠে দৌড় করিয়েছো ফর্দ ধরিয়ে দিয়ে।

-তোর বাপী এমনিতেই দৌড়ায়, ফর্দ ধরাও আর না ধরাও। এখন খেয়ে বল দেখি কেমন হয়েছে, বলে আরো একটা কচুরি মেয়ের প্লেটে তুলে দেন।

-আহা! ফাটাফাটি হয়েছে মা। তুমি রান্নার ক্লাস করাতে পারো, অনেকেই শিখে নিতে পারবে। নিজের সুখ্যাতি শুনে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন পরম স্নেহে। আসল কথা কাকে উদ্দেশ্য করা বলা সে ঋষভ ঠিক বুঝতে পারে। তার মা রান্না থেকে শত হস্ত দূরে- যেটাও করে কোনোমতে। শাশুড়ি মা'র হাতের রান্না শ্বশুরবাড়িতে আসার একটা প্রলোভন ঋষভের কাছে। কিন্তু ওই বাপ-বেটী! হাঁপ ধরিয়ে দেয়। সাধে কি একবেলা কাটিয়েই পালাতে চায়। কিন্তু ঋষভ আজো আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকালেই এক্কেবারে প্রেমনদীতে হাবুডুবু.. ওই, ওই সুযোগটাই নেয় আত্রেয়ী। কথা অন্যদিকে ঘোরায় ঋষভ,

-মা টিকলু আর টুবলু আসবে বললেন কাল। কখন আসবে?

-এসে যাবে এইবার মনে হয়। ওরা এলে জলখাবারের পাট চুকিয়ে দুপুরের রান্না সারতে হবে। তোমরা তো আবার বিকেল বেলায় বেরিয়ে যাবে বললে। কথা শেষ হতেই বেল বাজলো। ওই ওরা বোধহয় এলো, মিঠু দরজাটা খোল তো..

টিকলু আর টুবলু আত্রেয়ীর পিসতুতো ভাই। কিন্তু মন-মেজাজে দুরতুতো কোনো মিল নেই। ওরা দু' ভাই আমায়িক, হাসিখুশি। মেজাজী দিদিকে বেশ ভয় পায়। ঋষভের সাথে ওদের খুব ভাব- খোলামেলা সম্পর্ক। ওরা এলে তাস-দাবা-সিনেমা নিয়ে তবুও সময় কাটে। হৈ হৈ করে মোটামুটি সময়টা কেটে গেল খেলায়-গল্পে ওদের সাথে।

দুপুর বেলা। সবাই খাওয়ার টেবিলে আবার। আত্রেয়ী মা'র সাথে পরিবেশনে হাত লাগিয়েছে। একে একে নানা সুস্বাদু পদ দিয়ে সাজানো টেবিল। শ্বশুর মশাই বসলেন এসে। এসেই প্রথম কথা- শুরু করে দাও ব্রাদার, ঠাণ্ডা করে লাভ কি!

আবার 'ব্রাদার'- এখন খাবার টেবিলে চলতেই থাকবে এটা ভালো করে খেয়ে দেখো ব্রাদার, একদম তাজা, এইসব চট করে পাওয়া যায় না। ভাগ্নেদেরকেও ওই এক সম্বোধন। গল্পে, খাওয়ার গোড়ায় জল ঢেলে দেবে ওই সম্বোধন। ওনার ভ্রুক্ষেপ নেই। যেন ওতেই ওনার

আত্মতুষ্টি। মানুষ এতো অদ্ভুত হয় কি করে! মনে মনে ঋষভ আবার বলে, 'হনুমান'..

শাশুড়ি মা অবশ্য বলতেই থাকেন- এটা নাও, ওটা নাও, আর একটু নাও..জামাই আদর নির্বিঘ্নে সমাধা হয়। সকালের গন্ডগোলের আঁচ জামাই আদরে পড়ে না।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল এলে বাড়ি যাবার পালা। পোশাক পড়ে তৈরী। ভদ্রতার খাতিরে আবার শ্বশুরের কাছে গেল। নমস্কার করে মাথা তুলতে- উনি বলে উঠলেন, এসো আবার ব্রাদার সুবিধা করে।

উফফফফ, সেই 'ব্রাদার'.. মাথা নেড়ে বেরিয়ে আসে ঋষভ। শাশুড়ি মা'কেও প্রণাম করে। মাথায় হাত দিয়ে, চিবুক ছুঁয়ে আর্শীবাদ করেন। মিঠুকে বলেন, ওদের টিফিন ক্যারিয়ার গাড়িতে তুলে দে তো মিঠু। টুবলু, টিকলুও দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে। আত্রেয়ী গাড়িতে উঠলে ঋষভ গাড়িতে স্টার্ট দিলো। হাত নেড়ে আত্রেয়ী বলে উঠলো, 'জন-জামাই-ভাগ্না তিন নয় আপনা' এটা কিন্তু মনে রেখো ভালো করে মা। শেষে হুলটা ফুটিয়েই ছাড়লো- কি মেয়ে রে বাবা! অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন মা। ওদিকে বাপের মুখে গর্বিত হাসি, ছাতি ফুলে বেশ কয়েক ইঞ্চি বেড়ে গেল মনে হয়। ক্যাবলার মতো মুখ করে ভাগ্নেরা দাঁড়িয়ে থাকলো, তার থেকেও বেশি ক্যাবলা হয়ে ঋষভ তাকিয়ে থাকলো গাড়ির কাঁচ দিয়ে সামনের রাস্তায়।

তারপর গাড়ি গড়িয়ে চললো যান্ত্রিক শব্দে.. দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো ছোটো হতে হতে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হলো, ঠিক যেমন অদৃশ্য হুল বিঁধে থাকলো সম্পর্কের মাঝে।

আলাপী মন ওয়েবের প্রকাশিত বই

প্রকাশক অক্ষর কুঠি পাবলিকেশন
সম্পাদনায়- রীণা ত্রিবেদী
মুল্য-১৫০/-
পাওয়া যাবে কলেজ স্ট্রীটের বিভিন্ন বইয়ের দোকানে- ধ্যানবিন্দু, পাতিরাম, বলাকা বুক স্টল, আদি নাথ ব্রাদার্স , আদি দে বুক স্টল প্রভৃতি। এছাড়াও যোগাযোগ করুন
বুক ডিলার (সাহেব) ৮২৪০০০৪৩২০

আলাপী মন ওয়েবে নিয়মিত লিখুন

আমাদের -
হোয়াটস অ্যাপ নং- 8910116253
মেইল- alapimon@gmail.com
লেখা নির্বাচিত হলে ৫ - ৭ দিনের মধ্যে ওয়েবে প্রকাশ করা হবে।

শক্ত লাঠি

লোপামুদ্রা ব্যানার্জী

আজ বাড়ি চলো আমি মা'কে সব বলবো। রোজ রোজ আমাদের স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই বখাটে ছেলেদের সাথে মেয়েদেরকে হাঁ করে গিলে খাওয়া । তোমার জন্য আমার মান সম্মান একটুও রইল না বান্ধবীদের কাছে।

_ ওরে আমার সতী সাবিত্রী মেয়ে। তুই যে কি করে চলেছিস সব আমি জানি। শুধু মুখে কিছু বলি না। তবে এবার বলবো।তুই আমার নামে মায়ের কাছে নালিশ করবি আর আমি বলবো না!

রূপা চিৎকার করে বলে উঠলো, যাও যাও মাকে গিয়ে বলো আমার নামে। যা খুশি বলো।পারলে আরো একটু মশলা মাখিয়ে পরিবেশন করো। দেখো দাদা, তুমি যদি ভেবে থাকো আমাকে ব্ল্যাকমেল করবে, করো।যত খুশি করো। আমি আজকের ঘটনাটা মাকে তো বলবোই।

কথাগুলো চাবুকের মতো চালিয়ে সাইকেলের পিছনে মিলিকে বসিয়ে ফুল স্পিডে বেরিয়ে গেল রূপা।

লেখক- লোপামুদ্রা ব্যানার্জী

রূপার দাদা রূপ খলিসাকোটা গার্লস স্কুলের সামনে রাগে ফুঁসতে লাগলো। এত বড় অপমান,এত লোকের সামনে! আজ পর্যন্ত কেউ তাকে অপমান করার সাহস পায়নি।

রূপের সর্ব কাজের সহায়ক তিন তিন বার উচ্চমাধ্যমিক ফেল বিকি বলে ওঠে, রূপ ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক হলো না। তোর নিজের বোন হয়ে একটা বাইরের মেয়ের জন্য তোকে এত লোকের সামনে অপমান করে গেল। রূপা যদি আমার বোন হতো তাহলে ওকে দেখিয়ে ছাড়তাম। রূপ চোখে মুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে বিকিকে বলে, একটা সিগারেট দে তো। একটু সুখ টান দিই।শালা, মেজাজটা পুরো খারাপ করে দিলো।

এদিকে রূপা মিলিকে নামিয়ে নিজের বাড়িতে এসেই সাইকেলটাকে কোন রকমে স্ট্যান্ড করেই মা মা চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তোলে।

রান্না ঘর থেকেই রূপার মা তনিমা বলে, ওরে আমি রান্নাঘরে। তুই এখানে আয়।

রূপা প্রায় এক ছুটে রান্নাঘরে এসে হাজির হয়। রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে। পড়ন্ত বিকেলের রোদের মধ্যে যা জোরে সাইকেল চালিয়ে এসেছে তাতেই চোখ মুখ তো লাল হয়ে উঠেছে।

তনিমা মেয়ের চোখ মুখ দেখে বলে, কি রে চোখে মুখে আগে ঠান্ডা জলের ছিটে দে। তারপর অন্য কথা।

রূপা বেসিনে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে এলেই তনিমা রূপার সামনে লেবুর শরবতের গ্লাসটা তুলে ধরে। আর বলে,

রান্না ঘরে প্রচন্ড গরম। চল, ডাইনিং টেবিলে বসবি চল ফ্যানটা চালিয়ে।

রূপা লেবুর শরবত আর ফ্যানের হাওয়ায় একটু ঠাণ্ডা হয়ে বলে, মা আজকে তোমাকে এর একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। না হলে কিন্তু দাদা একদিন আমাদের সবার মুখে চুনকালি মাখাবে।

তনিমা আশ্চর্য হয়ে বলে, মানে? তোর দাদা আবার কি করলো? তুই তো স্কুলে গিয়েছিলি আর রূপও কলেজ গেছে।

- মাথা কলেজ গেছে। তোমার গুণধর ছেলে মাসে কদিন কলেজ যায় একবার তাকে জিজ্ঞাসা করবে একদিন।

- দেখ রূপা হেঁয়ালি ছেড়ে সব কিছু খুলে বল আমায়।

-মা দাদা সকাল বেলায় কলেজ যাওয়ার নাম করে গরম ভাত খেয়ে আমাদের স্কুলের পাশে রবি কাকুর পানের গুমটির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্কুলের মেয়েদের উত্যক্ত করে।

তনিমা যেন আকাশ থেকে পড়লো। অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে, সে কি রে! কবে থেকে এই সব শুরু করেছে রূপ?

- মাস পাঁচেক তো হবেই। নাইন, টেন, ইলেভেন, টুহেলভ-এর মেয়েদেরকে দেখে নোংরা মন্তব্য, চিরকুটে লিখে প্রেম নিবেদন এইসব তো করতো এতকাল। তবে আজকে যে কান্ডটা করলো তাতে আমারই মরে যেতে ইচ্ছা করছে।

তনিমা ভিতর ভিতর প্রচন্ড অস্থির হচ্ছে। তবু নিজেকে সামলে বলে, কি করেছে আজ রূপ তোদের স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে?

রূপা তনিমার চোখে চোখ রেখে বলে, দাদা আজ মিলির হাত ধরে টানে। তারপর বলে, আই লাভ ইউ জানেমন।

মিলি তো কোন রকমে হাতটা টেনে সরিয়ে নেয়। তারপর প্রায় ছুটতে ছুটতে স্কুলে এসে হাজির হয়। আমরা তখন সবাই প্রার্থনার লাইনে দাঁড়িয়ে।মিলিকে হাঁপাতে দেখে আমাদের বড়দিদি সুলেখা ম্যাম জিজ্ঞাসা করলে মিলি বলে, রূপার দাদা আমার সাথে অসভ্যতা করেছে।

মিলির কথা শেষ হতে না হতেই এতো ছাত্রী, ম্যাডাম সবার ঘৃণার চোখগুলো যেন আমার দিকে ধেয়ে এলো। মা আমার যে কি লজ্জা হচ্ছিল তা তোমাকে বলতে পারবো না।

ছুটির সময় আবার দেখি দাদা তার দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে রবি কাকুর পানের গুমটির সামনে। আমি মিলির সঙ্গেই আজ গুমটিটার পাশ দিয়ে এলাম। তবে আজ আর আমি চুপ থাকতে পারি নি। দাদাকে সবার সামনে দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছি।

এতো কথা শোনার পর তনিমার আর কোনো কথা বলতে ইচ্ছা করলো না। সে চুপচাপ ঠাকুর ঘরের দিকে গেল। একটু আগেই তার শাশুড়ি মাতা সন্ধ্যা পূজার জোগাড় করে রেখে পাশের বাড়িতে গেছেন। ধূপের সুগন্ধে ঠাকুর ঘর খানা ভরা। ধূপের সুগন্ধে আজ আর তনিমার মনটা প্রশান্তিতে ভরে উঠলো না। বরং অশান্তির গুমোট মেঘ ছেয়ে গেছে তনিমার মনখানা।

করজোড়ে হাঁটু গেড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা মায়ের ছবির সামনে বসে রইল কিছুক্ষণ। চোখের কোণে জমাট বাঁধছে অশ্রুকণা।

বিড়বিড় করে তনিমা বলে ওঠে, প্রভু আমি পারলাম না রূপের প্রকৃত মা হয়ে উঠতে।

আমি ওকে সুশিক্ষা দিতে পারি নি বলেই তো ও এমন উশৃঙ্খল হলো।ঠাকুর আমি তো আমার ষোলআনা দিয়ে ওকে বড় করতে চেয়েছিলাম। তাহলে কি আমিই ঠিক পথে চলতে পারি নি। তাই আমার সন্তান এমন অসামাজিক হলো।

চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে তনিমার চিবুক। হাজার প্রশ্ন মাথায় এসে ভীড় করছে। কিন্তু সমাধানের পথ তো কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না। পাগলের মতো ঈশ্বরকে ডেকে চলেছে একটু সঠিক পথ পাওয়ার জন্য।

ইতিমধ্যে রূপার ঠাকুমা পাড়া বেড়িয়ে ঘরে ফিরে আসে। ঠাকুর ঘরে তনিমাকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞাসা করে, কি হলো গো বৌমা? কারোর কিছু হলো না কি?

তনিমা ধড়ফড় করে উঠে পড়ে। আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা নিজের ঘরে গেল। ধড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। রূপা ও তার ঠাকুমা একে অপরের মুখের দিকে চেয়ে রইলো অবাক নয়নে।

মিনিট পাঁচেক পর তনিমা সুতির রং চটা ছাপা শাড়ি খানা ছেড়ে একটা জর্জেটের শাড়ি পরে হাতে ছোট একখানা পার্স নিয়ে বেরিয়ে এলো।

রূপাকে ডেকে বলে, আমি একটু আসছি। যদি আসতে দেরি হয় আমার তাহলে বাবা, ঠাকুমা, দাদাকে চা করে দিবি। এই বলে এক মুহূর্ত আর নষ্ট না করে হন্তদন্ত হয়ে মেন গেট খুলে বেরিয়ে গেল।

রূপাও হতভম্বের মতো চেয়ে রইলো মেন গেটের দিকে। রূপার ঠাকুমা মেন গেটটা বন্ধ করে দিয়ে এসে নিজের মনেই বলতে থাকলো, এই তিন সন্ধ্যা বেলায় মহারানী আবার কোথায় চললেন কে জানে?

ঘড়ির কাঁটা তখন সাড়ে সাতটার ঘরে। রূপার বাবাও ফিরে এসেছেন অফিস থেকে। বাড়িতে ঢুকেই জানতে পেরেছেন তনিমা ঘরে নেই। রূপ ও তার ঘরে বই খাতা সামনে রেখে মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত।

হঠাৎ ডোর বেলটা বেজে উঠল। রূপাও বই খাতা সরিয়ে ছুটে যায় দরজা খুলতে এই আশায় যে তার মা ফিরে এসেছে বলে।

কিন্তু দরজা খুলে রূপা বাকরুদ্ধ। রূপাকে সরিয়ে ঘরে ঢুকছে তনিমা, সঙ্গে দুজন খাঁকি পোশাক ধারী পুলিশ।

রূপার বাবা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার! পুলিশ কেন?

তনিমা খুব ধীর স্থির ভাবে জবাব দেয়, আমি ডেকে এনেছি।

অবাক বিস্ময়ের সাথে রূপার বাবা বলে, মানে?

-রূপকে থানায় নিয়ে যেতে এসেছে এরা।

রূপার ঠাকুমা বলে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল বৌমা? কি বলছো, কি করেছো! তোমার হুঁশ আছে তো?

একজন পুলিশ কর্মী গম্ভীর স্বরে বলে, রূপ সরকার বাইরে বেরিয়ে আসুন। আপনাকে থানায় যেতে হবে।

রূপও রীতিমতো ভড়কে গেছে। কি সব হচ্ছে বাড়িতে। ওর মাথাতে আসছেই না ওর কোন কৃতকর্মের জন্য ওকে থানায় যেতে হবে।

রূপা এবার বিষয়টা আন্দাজ করতে পারছে।সে ধীরে ধীরে তনিমার কাছে গিয়ে বলে, মা থানা পুলিশ না করলেও তো চলতো।

তনিমা কটমট করে মেয়ের দিকে তাকাতেই রূপা চোখ নিচু করে দাঁড়ায়।

রূপের বাবা এবার বিরক্ত হয়ে বলে, তনিমা এইসব কি হচ্ছে একটা ভদ্র লোকের বাড়িতে।

তনিমা কিছু বলার আগেই মেনগট ঠিলে ভিতরে আসে মিলি। সে বলে, কাকু আপনার ছেলে প্রায় দিনই আমার মতো অনেক মেয়েকে বিরক্ত করে। ঠুনকো মান সম্মানের ভয়ে আমরা সবাই চুপ থেকে এসেছি এতকাল।

কিন্তু আজকে সাড়ে দশটার সময় প্রার্থনার জন্য ছাত্রীরা সব লাইনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল আগেই। আমি আজ একাই স্কুলে যাচ্ছিলাম। আমাকে আজ একা পেয়ে রূপার দাদা আমার হাত টেনে ধরে প্রেমের কথা বলতে আসে।

আমি কোনোরকমে হাত ছাড়িয়ে ছুটতে ছুটতে স্কুলে পৌঁছাই। ম্যামদেরকে বললেও কেউ কোন প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে নি।সবাই বললো ব্যাপারটা চেপে যাওয়াই ভালো।

যদিও আজ স্কুল থেকে ফিরি রূপার সঙ্গেই। রূপা দু'কথা শোনালেও আজ সন্ধ্যা বেলায় যখন তনিমা কাকিমা আমাদের বাড়িতে গিয়ে আমার মা'কে সব ঘটনা বলে তখন আমার মা আমাকে সঙ্গে নিয়ে থানায় আসে।আর থানা থেকে পুলিশ নিয়ে সোজা আপনাদের বাড়িতে।

রূপের আর বলার কিছুই রইল না। মুখ নিচু করে চুপচাপ পুলিশের গাড়িতে গিয়ে উঠে বসে।

রূপকে পুলিশে থানায় নিয়ে যাওয়ার পর রূপের ঠাকুমা তনিমাকে গাল পাড়তে শুরু করে। তনিমা তার শাশুড়ীর একটি কথারও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না। সে রূপের বাবার কাছে গিয়ে বললো, আমি পারলাম না রূপের নিজের মা হয়ে উঠতে। পাড়া প্রতিবেশী সবাই এখন বলবে, সৎ মা তাই তো নিজে থেকে ছেলেকে পুলিশের হাতে তুলে দিল।যদি রূপের আসল মা হতো তাহলে কখনই এইরকম কাজ করতো না।

রূপের বাবা প্রশান্ত বাবু বলে, আসল মা, সৎ মা এইসব আমি জানি না গিন্নি। আমি শুধু এটাই জানি, তুমিই রূপের প্রকৃত মা। যেভাবে শক্ত লাঠি হয়ে সন্তানকে পুরোপুরি অসামাজিক হওয়ার হাত থেকে তুমি বাঁচালে তা সত্যি নজির বিহীন।

আমরা মা বাবারা সন্তান স্নেহে অন্ধ হয়ে ওদের অনেক অন্যায়কে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করি। যেগুলো পরবর্তী সময়ে বিরাট এক অপরাধে পরিণত হয়।

তনিমা তোমার এই মানসিক দৃঢ়তার জন্য রূপ পথভ্রষ্ট হবে না ভবিষ্যতেও। দেখে নিও।

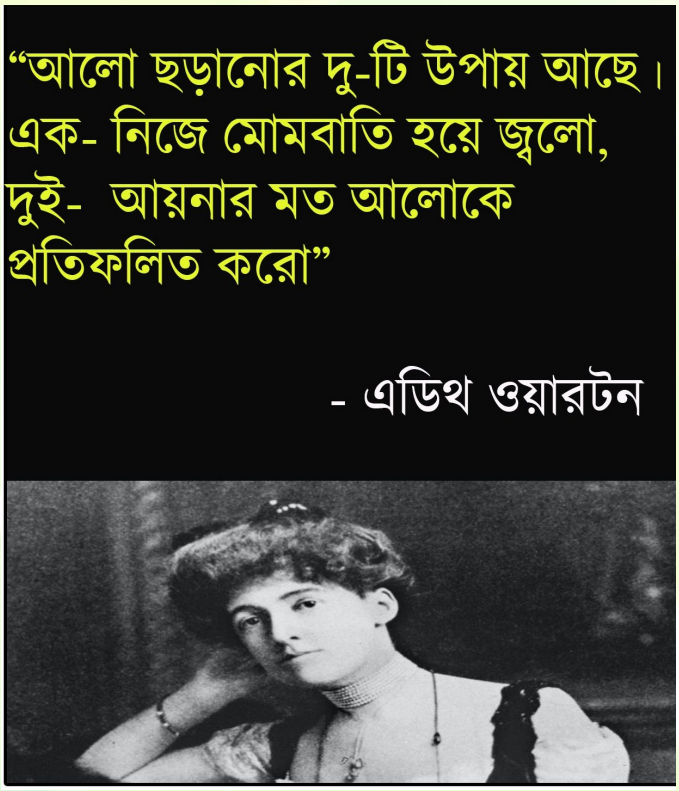

সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি ; কবি- কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সারবত্তা রয়েছে, এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্যবিকীরণ তাদের সাহায্য করেছে। কিন্তু' সকলকে সাহায্য করতে পারে না ; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হয় ; নানারকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়।

- জীবনানন্দ দাশ

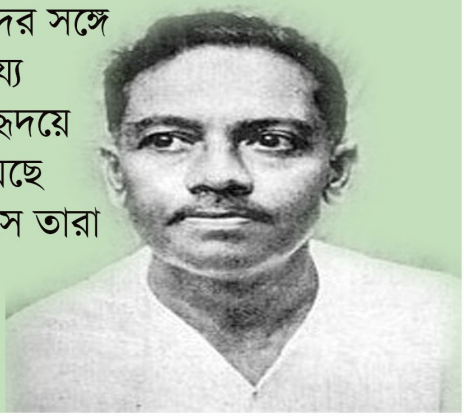

মিথ্যা গুজব

তমালী বন্দোপাধ্যায়

আজ ভোরবেলা মিঠি আর ওর মা যখন তাড়াহুড়ো করে রেডী হচ্ছে...ঠিক তখনই বাড়িওয়ালী মাসিমা এসে ওদের বললেন- "তোমাদের এ বাড়িতে আর থাকতে দিতে পারবো না বাপু। আমি আর তোমার মেসোমশাই সাধাসিধে লোক, তাই কিছু খোঁজখবর না নিয়েই বাড়িভাড়া দিয়ে দিয়েছি শুধু তোমাদের অসহায়তার কথা ভেবে।কিন্তু এখন তোমাদের নিয়ে যা-সব কথা কানে আসছে বাপু...কানপাতাই দায়। ছিঃ ছিঃ কী ঘেন্না, কী ঘেন্না!"

লেখক- তমালী বন্দোপাধ্যায়

"মাসিমা এসব মিথ্যা গুজব। আমরা কাজ করে মাথা উঁচু করে বেঁচে আছি। কারুর কাছে হাত পাতি না...সাহায্য ভিক্ষা করি না...কাউকে পাত্তা দিই না। এটাই আমাদের দোষ। আমি কাজের জায়গার ফোন নাম্বার দিচ্ছি আপনি খোঁজখবর নিয়ে দেখতে পারেন।"

"না বাপু, আমার ওসব লাগবে না। এই বুড়ো বয়সে এসব নোংরা ঘাঁটার ইচ্ছে আমাদের নেই। ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করি। একটু শান্তিতে থাকতে চাই। এসব উৎপাত আর ভালো লাগে না বাপু। তোমরা ঘর ছেড়ে দাও।"

"কিন্তু আমাদের একবছরের চুক্তি আছে··· তার আগে ঘর ছাড়বো কেন?"

"সে তোমরা মেসোমশাইয়ের সাথে কথা বোলো." বলে তিনি পিছন ঘুরে হাঁটা দিলেন।

এই নিয়ে পরপর চারটে বাড়ি পাল্টাতে হলো। আগে বস্তিতে যখন থাকতো অসুবিধা হতো না। কিন্তু ভদ্রপাড়ায় ঘর নিতে গিয়েই যত্ত অসুবিধা।

উত্তর কলকাতার দীননাথ লেনের এই দোতলা বাড়ির একতলায় অল্প কিছু দিন হ'লো ভাড়া এসেছে মিঠি আর তার মা। মিঠির বাবা মারা যাবার পর অনেক কষ্ট করেই মেয়েকে বড় করে তুলেছেন মিঠির মা সীমা। শ্বশুরবাড়ি থেকে কোনোরকম সাহায্যই মেলেনি উপরন্তু স্বামীর বসত বাড়িতেও ঠাঁই মেলেনি ওদের। বাপের বাড়ির অবস্থাও তথৈবচ। আত্মীয় মানে না'কি আত্মার সম্পর্ক। আজ তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে ওরা। বিপদে পড়লে সবাই একা- এ কথাটা মিঠি আর সীমার মতন বেশী আজ কেউ জানে না।

অবশ্য পিছনে নিন্দে মন্দ আলোচনা করতে কেউ ছাড়ে না।সে পাড়াপ্রতিবেশীই হোক আর আত্মীয়স্বজন। কানাঘুষো আলাপ চলতেই থাকে কীভাবে ওদের চলছে তা নিয়ে।

এই কাজের বাজারে কাজ পাওয়াটাই কঠিন। যদিও কোনকাজেই পিছপা নয় সীমা। তাই বড় নার্সিংহোমে আয়ার কাজটাই নিয়ে নেয়। নার্সিংহোমে হাড়ভাঙা খাটুনির পরেও ছোটখাটো উপরি যা কাজ পেয়েছে তাই করেছে ও। তবে রাতের ডিউটি নেয়নি মেয়ের জন্য। মেয়েকে একলা রাখতে মন চায়নি সীমার। মেয়েও ছোটবেলা থেকে খুব বুঝদার।

সেই ভোরবেলা উঠে হাতে হাতে কাজ গুছিয়ে দেয় মা'কে। তারপর মা বেড়িয়ে গেলেই ও নিজে রেডী হয়। মিঠি বেশ বুদ্ধিমান মেয়ে। লেখাপড়াতেও মন্দ নয়।স্কুল, কলেজের গন্ডী টপকে গেছে অনায়াসেই। ইংরেজিতে ভালো কথা বলতে পারে, কম্পিউটার চালাতে জানে, বেশ চটপটে, স্মার্ট মেয়ে।

মিঠি কিছুদিন আগে একটা বড় পাঁচতারা হোটেলে কাজ পেয়েছে এক বন্ধুর সাহায্যে। বন্ধুটি ওই হোটেলের রিসেপশনিস্ট। মিঠিকে কাজের অফারটা দেওয়ায়, ও দু'বার ভাবেনি। আর তাছাড়া স্যালারিও ভালো। হোটেলে গেস্টদের দেখাশুনো করতে হয় ওকে। তারপর কনফারেন্স বা পার্টি থাকলে তো কাজ আরো বেড়ে যায়। রাত হলে হোটেলের গাড়িই বাড়ি পৌঁছে দেয়। কখনো কখনো রাতে থাকতে হয় ওখানে। ওর মিষ্টি ব্যবহারে আর কাজের দক্ষতায় সহজেই সবার মন জয় করতে পারে ও।

ওদের মা-মেয়ে সারাদিনই কাজে ব্যস্ত থাকে। বাড়ি ফিরে ঘর গুছানো, রান্না, জামাকাপড় কাচা, বাসন মাজা··· অনেক কাজ!ছুটির দিনে মা-মেয়েতে মন্দিরে যায়··· ঈশ্বরই একমাত্র ভরসা ওদের।আর নয়তো টিভি দেখে, গল্প করে কাটিয়ে দেয় মা-মেয়ে। ওরা দু'জনে দুজনার বন্ধু। কাউকেই বেশী পাত্তা দেয় না। আর খুব গাম্ভীর্য নিয়ে চলে।অভিজ্ঞতায় ওরা জানে একা মেয়ে দেখলে অনেক স্বঘোষিত অভিভাবক জুটে যায়...যারা সুযোগসন্ধানী। পাড়ায় মহিলামহলে শুধু পরের ঘরে কে কী করছে··· এই নিয়েই মজলিস বসে। যা ওরা এড়িয়ে চলে।

আর ওদের এই দৃঢ় মনোভাব আর শান্তির মাথা উঁচু করা জীবন অনেকের ঈর্ষার কারণ। মহিলা তো বটেই অনেক পুরুষ মানুষও ওদের ধারেকাছে আসতে না পেরে ওদের নিয়ে মন্দ রটায়। মিঠি হোটেলে যায়, রাত কাটায় মাঝরাতে আবার গাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়··· ওরাও সে সুযোগে আলোচনার রসদ পায়। ওরা বলে মা নিজের মত খারাপ কাজে মেয়েকেও নামিয়েছে। আর সেই গালগপ্পো গুজবের ডানা মেলে। যার ফলে কোনো পাড়াতেই ওরা টিঁকতে পারে না বেশীদিন।

মিঠি ওর মাকে বলেছে- "আর কিছুদিন অপেক্ষা করো। কিছু টাকা জমাই।আর বাকীটা লোন নিয়ে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট কিনে নেবো। তখন আর কেউ আমাদের বাসা ছাড়া করতে পারবে না। আর তুমিও আর কাজ করবে না। বাড়ীতে বিশ্রাম নেবে।তোমার মেয়ে আছে তো তোমার সাথে।"

মা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে খুশীর হাসি হাসেন কিন্তু চোখে জল ভরে আসে। খুশীর অশ্রু যে আলোয় আলোয় ভরা।

আমরা যখন কুরুক্ষেত্রে মাস্টার মশাই

অঞ্জনা গোড়িয়া

শবদেহ শোওয়ানো আছে বাড়ির উঠানে। সবাই ভীড় করে দাঁড়িয়ে। দূর দূর থেকে ছুটে আসছে মানুষ। শুধু মাত্র চোখের দেখা দেখবে বলে তাঁদের প্রিয় মাস্টার মশাইকে। যে মাস্টার মশাই গ্রামের মেয়েদের জন্য একটা সেলাইয়ের স্কুল খুলেছে। ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের নিজের বাড়িতে যত্ন করে বর্ণপরিচয় শিখিয়েছে। গ্রামের অসহায় মেয়েরা সময়ের ফাঁকে ফাঁকে কিছু হাতের কাজ করে নিজেদের উপার্জন করতে শিখেছে।

এমন কি একটা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রও গড়েছে। বেশ কিছু গাঁয়ের অশিক্ষিত, মুর্খ মানুষজন নিজের নাম সই করতে শিখেছে। চিঠি পড়তে শিখেছে। সেই গাঁয়ের মানুষরা, মাস্টারমশাইকে এত দিন মাথায় করে রেখেছিল।

লেখক - অঞ্জনা গড়িয়া

একমাস হলো অবসর নিয়েছেন কর্মজীবন থেকে।

তখন থেকেই শুরু হয়েছে কুরুক্ষেত্রের লড়াই। প্রথমে ঠান্ডা লড়াই তারপরই শুরু হলো গরম লড়াই। প্রফিডেন্টফান্ডের টাকা কার ভাগে কত আসবে? এছাড়া জমি, সম্পত্তি আর এই বাড়িটা নিয়ে শুরু হলো মনোমালিন্য। মাস্টারমশাইয়ের তিন ছেলে আর এক মেয়ে। প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত। সবারই বিয়ে হয়ে গেছে। গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি দিয়েছে। নতুন ফ্লাট কিনেছে। গাঁয়ের মাটিতে ফিরেও তাকায় না।

এখানে এলে নাকি মাটি আর ধোঁয়ার স্পর্শে শ্বাসকষ্ট হয়। দম বন্ধ হয়ে আসে এদের।

বৃদ্ধ মাস্টারমশাইকে অবশ্য নিয়ে যেতে চেয়েছিল ছেলেরা। কিন্তু এই গাঁয়ের মানুষজনকে কিছুতেই ভুলতে পারবেন না উনি। তাই এখানেই রয়ে গিয়েছেন গাঁয়ের টানে।

গাঁয়ের পথে পথে গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের নিয়ে চারাগাছ লাগিয়েছেন। সেগুলোর পরিচর্চা নিজেই করেন। গাঁয়ের কানাই, বলাই, মুনিয়া, রামু সবার প্রিয় মাস্টার দাদু। এদের সাথে ভারি ভাব দাদুর। এদের সঙ্গে একসাথে খেলার মাঠে খেলতে যেতে মাস্টার মশাইয়ের বেশ লাগে। এমন কি গাঁয়ের যে কোনো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন যে কোনো পরিস্থিতিতে।

আজ সেই মাস্টারমশাই-এর মৃতদেহ বাড়ির উঠানে পড়ে আছে অসহায় ভাবে। একটু আগুনের জন্য।

শহর থেকে একে একে ফিরে এসেছে ছেলে মেয়েরা। তবু কেউ দাহ করতে রাজি হলো না। তিন ভায়ের মধ্যে শুরু হলো সম্পত্তি নিয়ে জটিলতা।

জানতে পেরেছে মাস্টার মশাই নিজের চাকরির সমস্ত টাকা দান করেছেন একটা দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র

গড়তো। সেই সঙ্গে গাঁয়ের জমিগুলো গাঁয়ের মানুষের চাষের জন্য বিলিয়ে দিয়েছে। কারণ ছেলেরা যে কোনো দিনই আর এ মুখো হবে না তা তিনি জানতেন।

অবশ্য তিনি এটা জানতেন না, সম্পত্তির জন্য তাঁর শিক্ষিত ছেলেরা কেউ মুখাগ্নি করতে চাইবে না।

নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল পাকিয়ে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করলো।

গ্রাম সুদ্ধ লোক কেঁদে ভাসাচ্ছে এমন দরদী মাস্টারমশাইয়ের জন্য। আর নিজের রক্তের জন নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করছে এই বাড়িটা নিয়ে। এটুকুই বাকি ছিল বিলিয়ে দিতে।

কেউ ছাড়বার পাত্র নয়। এই বাড়ি বিক্রি করেই বাবার ক্রিয়াকর্ম সারতে হবে। এমন বাবার জন্য কেউ একপয়সাও খরচ করতে রাজি নয়।

সারাদিন ধরে চেঁচামেচি চলতেই থাকে। মৃতদেহ পড়ে আছে রোদে বাড়ির উঠানে।

বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। তুমুল লড়াই শুরু হলো।

এমন সময় পাড়ার বিন্দি পিসির ছেলে রামু এলো হাতে একটা আগুনের ফুলকি নিয়ে। হুঙ্কার দিয়ে ওঠে,"আমি দেব আগুন। মাস্টারমশাইকে আমি শান্তি দেব। আমার দাদু বড্ড কষ্ট পাচ্ছে।"

দলে দলে সবাই এলো।

ছুটে এলো গাঁয়ের কানাই, বলাই, মুনিয়া, আরো অনেকে। সবার আদরের মাস্টার মশাই সবার কাঁধে চড়ে চললো শশ্মানে। মহা শান্তির আশ্রয়ে।

বার্ষিক অনুষ্ঠানের কিছু মুহূর্ত

সেঞ্জ

সঞ্জিত মণ্ডল

স্ট্রেঞ্জ! জায়গাটার নাম সেঞ্জ! নামটা দেখে আমিও কম অবাক হইনি। আর সেই জন্যেই জায়গাটা দেখার ইচ্ছেটাকে গুরুত্ব না দিয়ে পারিনি। কুলু মানালীর কুলু থেকে যে রাস্তাটা ডানদিকে এঁকেবেঁকে ওই দূরে পাহাড় পুরের দিকে হারিয়ে গেছে ওর প্রায় শেষ প্রান্তে সেঞ্জ। কুলু থেকে প্রায় ঘন্টা তিনেকের পথ। এখানে এসে যে ওকে দেখবো তা ভাবতেও পারিনি।ও মানে সেই রতন। রতন গাঙ্গুলি। দেওঘরে বাড়ি, আমারই সহপাঠী ছিল এককালে। কিন্তু এই পান্ডব বর্জিত পাহাড়ে কি করছে রতন! আমিই আগ বাড়িয়ে আলাপ করি, আরে রতন না?

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর বাদে দেখা। আমার গলা শুনেই ঘাড় ঘোরায় রতন। বলে আরে, শোভন না?

আমি বলি, জিজ্ঞেস করছিস কেন? কনফার্ম। আমিই শোভন। তা তুই এই পান্ডব বর্জিত পাহাড়ে কি করছিস এখন? হঠাৎ যেন উবে গেলি দেওঘর থেকে, কি ব্যাপার ছিল তখন?

রতন মিটিমিটি হাসে, আরো কাছে ডেকে বলে আমি তো এখানেই আছি রে শোভন। ওই দেখ ওদিকে তাকা, ওই যে দূরে দেখছিস ছবির মতন, ওটা এই অধমের গরীবখানা। তোর তাড়া নেই তো? অনেক দিনের পরে দেখা যখন, চল এই অধমের গরীব খানায়, খানিক পায়ের ধুলো

দিবি, গল্প গুজবে কাটাব কিছুক্ষণ।

আমি বলি, কুলুতে ফিরতে হবে যে।

রতন বলে, সে দেখা যাবে'খন। তোকে কুলুতে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার। এখন চল আমার সাথে।

রতনের গাড়ি বেশ কিছু চড়াই উতরাই ভেঙে যে গরীব খানার সামনে এসে থামল তাকে প্রাসাদ বললেও কম বলা হবে। বিশাল গেট খুলে, বিরাট লন পেরিয়ে বাড়ির মূল গেটে পৌঁছালে যিনি অভ্যর্থনা জানালেন, তিনি পাঞ্জাব দুহিতা। হাত জোড় করে তিনি বললেন, নমস্তে, অন্দর আইয়ে।

রতন বাংলাতেই বললো, হীনা, এ আমার ছেলেবেলার বন্ধু শোভন। আমরা দুজন হরিহর আত্মা ছিলাম। ওকে ধরে আনলাম।

হীনা বলল, সুক্রিয়া জনাব, বসুন, বন্ধুর সাথে গল্প করুন। ম্যায় কফি লাতি হুঁ।

পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই- হীনা, বয়স কালে যে যথেষ্ট সুন্দরী ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হীনা কফির জন্য ব্যস্ত হল। আমি মনে মনে ভাবছি, ছোট বেলায় পড়েছিলাম, রতনে রতন চেনে, তা এরা রতনকে চেনে কি করে! এখানে রতনকে রাজা রাজড়া বলে মনে হচ্ছে, আমারই এককালের সহপাঠী বন্ধু, তার এমন চোখ ধাঁধানো বৈভব! রতন বোধহয় আমার মনের কথা পড়তে পারলো, মৃদু হেসে শুরু করলো, সে এক অঘটন বলতে পারিস। স্কুল ফাইনালে আশানুরূপ রেজাল্ট হল না। বাবার স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল, অবধারিত পিটুনি খাবার ভয়ে যা থাকে কপালে বলে ট্রেনে চেপে বসলাম। তারপর ভাসতে ভাসতে এখানে। ভেবেছিলাম

কুলুতে গিয়ে কুল কুল করে কেঁদে হালকা হব। ভোর বেলায় হোটেলের হাতায় বসে ভাবছিলাম, পকেটের রেস্ত প্রায় শেষ। হোটেল ছাড়তে হবে, বাড়ি ফেরার মুখ নেই, মা নেই যে বাবার আগ্নেয়গিরি থেকে আমাকে বাঁচাবে।অপরিচিত জায়গায় ভিক্ষে করলে কেউ কিছু জানতে পারবে না। চিন্তায় আর ভাগ্য বিড়ম্বনায় চোখ বন্ধ হয়ে গেলো। কতক্ষণ এভাবে চোখ বন্ধ ছিল জানি না, চমকে তাকিয়ে দেখি এক ভদ্রলোক আমার প্রায় মুখের উপর তাকিয়ে। উনি বললেন, কি ব্যাপার, সান ভিউ পয়েন্টে সান রাইজ দেখতে এসে কেউ এভাবে ঘুমায় নাকি?

লেখক- সঞ্জিত মণ্ডল

আমি অবাক হই, সামনে তাকিয়ে দেখি পূবের আকাশ সোনালী লালের আভায় ঝলমল করছে, থতমত খেয়ে বলি, না মানে, আমি..শেষ করতে পারি না আমার কথা। ভদ্রলোক বলেন, তা অমন আমতা আমতা কেন, আর একলাই বা কেন, বাড়ি থেকে পালিয়ে নয়তো?

শুনেই আমার হাড় হিম হয়ে যায়, এই রে বাবার চর নয়তো, খুঁজতে খুঁজতে আমাকে ধরতে এসেছে।কথা পালটানোর জন্যে বলি, এই সানরাইজ তো রোজই দেখি, আজ একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

উনি বললেন, রোজ দেখো মানে, স্থানীয় নাকি?

আমরা তো এরকম স্থানীয়ই চাইছিলাম। এখানে থাকবে আমাদের হাইড্রাল প্রজেক্টের তদারকি করবে।

উনি আর কিছু বলার আগেই বলে দিই, আমার পকেট খালি, কাজ দেখতে পারি আগাম কিছু দিলে। মনে মনে ভাবি, আগে পয়সাটা তো দাও, পেটে কিছু পড়ুক, তারপর তোমার কাজ দেখবো না কেটে পড়বো সেটা ভাবা যাবে'খন।

প্রকাশ্যে ওনাকে বলি, আপনি কি আমাকে ধরবেন নাকি? উনি বললেন, ধরবো তো বটেই একেবারে ধরে বেঁধে নিয়ে যাবো। দৌড় লাগাবো কিনা ভাবছি, উনি বললেন, কি হে ছোকরা, কাজের কথা শুনে কি ভিরমি খেলে নাকি, এই নাও ধরো, এই পাঁচশো টাকা রাখো, চলো এক্ষুনি বেরোতে হবে। ওনার জীপে চেপে সেই প্রথম এখানে আসা। জীপে উঠেই বলি, কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে, আমার মনের সন্দেহ তখনো যায় নি। উনি বললেন, সেঞ্জ। আমি শুনলাম চেঞ্জ। তাই বলি, আমি ওসব চেঞ্জে ফেঞ্জে যাবো না। আমাকে আপনি ছেড়ে দিন। উনি বলেন, ছেড়ে দেবার জন্যেই বুঝি কড়কড়ে পাঁচশো তোমার পকেটে গুঁজে দিয়েছি?

তা ভদ্রলোক আমাকে সত্যি সত্যিই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিলেন, কাজের ধরন আর এই দেব নিকেতন আমায় এমন মায়ার বাঁধনে বেঁধে ফেললো যে সে বন্ধন কেটে বেরোয় কার সাধ্যি। এতোক্ষণ পরে মুখ খুলি, বলি, মায়ার বাঁধনে যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছিস তা তো দেখতেই পাচ্ছি। রতন বুঝতে পেরে বলল, আরে, হীনার সঙ্গে আলাপ এই সেঞ্জেই, ও আমাদের প্রোজেক্টের উপর একটা সমীক্ষা করতে এসেছিল, দারুণ স্মার্ট ছিল, সমীক্ষার কাজে ওর বারবার যাতায়াতে কখন মন দেওয়া নেওয়া শুরু হয়েছিলো, ওদের বাড়ি থেকেই প্রস্তাব এসেছিল।আমিও না বলিনি।

এখন এখানে প্রায় দশটার বেশী প্রোজেক্ট আমার তত্ত্বাবধানে চলছে। তোকে বলা হয়নি, আমার বিয়ের দেখভাল থেকে সব কিছুই আমার সেই ভগবান ভদ্রলোক করেছিলেন। এই বছর দশেক হল উনি দেহ

রেখেছেন। তার আগে উনি আমার দুই ছেলের বিবাহ করিয়ে দিয়ে যান। আমার বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, পাঞ্জাবি মেয়ে বিয়ে করেছে, আমার সমস্ত হাইড্রাল প্রজেক্টের দায়িত্ব বড় ছেলেকে দিয়েছি। আর ছোট ছেল ডাক্তার, সে বাঙালী মেয়ে বিয়ে করে দেওঘরে চিকিৎসা করছে। আর এই যে দেখছিস, বাড়ি, প্রায় দশ একর এর চৌহদ্দি, দূর থেকে বাড়িটা স্বপ্নের মতো দেখায়। সবই আমার সেই ভগবানের ভদ্রলোকের দান, উনি বিয়ে থা করেন নি, কাজ পাগলা মানুষ, মারা যাবার আগে উনি ওনার সব কিছু আমাকে উইল করে দিয়ে যান।

হীনা শুধু কফি নয়, আলু পরোটা, কাবাব, আচার সমেত রাশিকৃত খাবার এনেছে।

এতোক্ষণ স্বপ্নাবিষ্টের মতো রতনের কাহিনী শুনছিলাম, কাহিনী শুনে বা খাবারের পরিমাণ দেখে মুখ থেকে একটাই শব্দ বেরিয়ে এলো, স্ট্রেঞ্জ! রতন আগের মতই শুধরে দিল স্ট্রেঞ্জ নয়, সেঞ্জ।

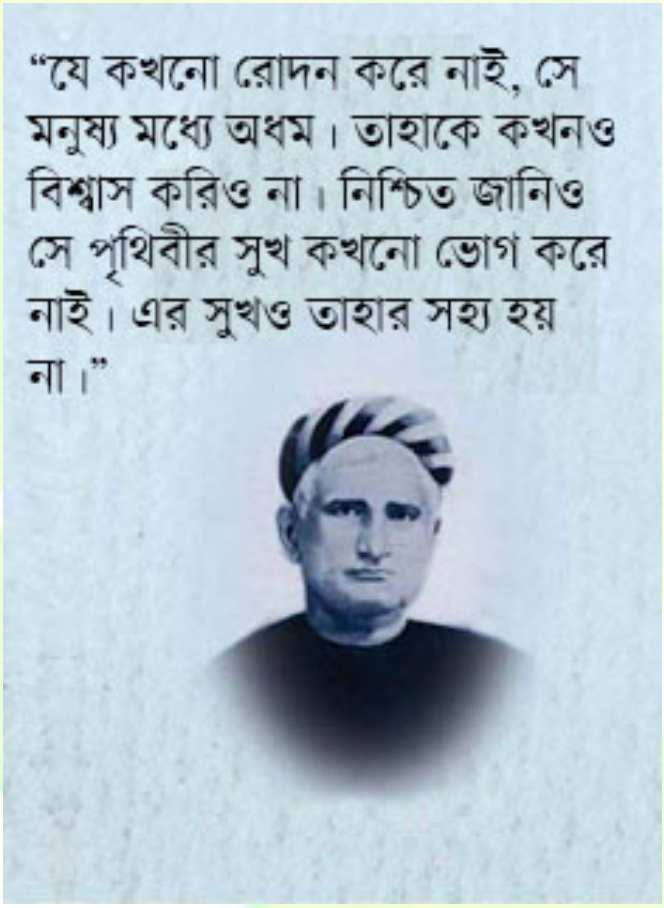

মায়াবী রাতে

শচীদুলাল পাল

সুরেশ অনেক বছর পর নিজের বাড়িতে ছুটিতে এসেছে। বাবা মা গত হওয়ার পর বাড়িতে অনেকদিন আসা হয়নি। সুরেশ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে রাজস্থানের জয়পুরে এক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিল। সেই থেকে ঘরটি দীর্ঘদিন ধরে তালা দেওয়া ছিল।

আজ ঘরে সে একা। পুরানো দিনের কথাগুলি একসাথে মনে ভীড় করতে লাগলো। গতকালই এসেছে তার নিজের বাড়িতে। দশ কাঠা জমির উপর বিশাল বাড়ি। বাগানে অনেক রকমের গাছ। এখন অবশ্য ঝোপঝাড়ে ভর্তি। খোলা যায়গায় ছোটবেলায় ছেলেমেয়েরা সব একসাথে খেলা করতো।

বিশাল সে বাগানের মধ্যে একদিকে ছিল খেলা ও দৌঁড়ানোর জায়গা। বাগানের শেষে একটা ছোট্ট দরজা। একদিকে গাছগাছালি। সূর্য অস্ত গেলে কেমন যেন একটা মায়াবী পরিবেশ। সন্ধ্যা নামলে অনেকে চলে গেলেও দামিনী রয়ে যেতো অনেকক্ষণ। সুরেশ তখন আঠারো। দুজনে ছিল সমবয়সী।
সামনে চাতালে বসে গাছের আড়ালে দুজনে অনেকক্ষণ কথা বলতো। উস্কোখুস্কো চুলে আর মায়াবী চোখে এক যাদু ছিল। খেলা শেষেও দুজনের আকর্ষণ তাদের চাতালের ধারে নিয়ে আসতো।

একদিনের ঘটনা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কেমন যেন আলো আঁধারি পরিবেশ। চাতালে দুজনে পাশাপাশি বসে ছিল। হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে হাসির খিল খিল শব্দ। তাকিয়ে দেখে সাদা কাপড়ে এক অচেনা মেয়ে।

চমকে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে দামিনী সুরেশকে জড়িয়ে ধরলো। আস্তে আস্তে মেয়েটি চলে গেলেও দামিনী কিন্তু ভয়ে এক ভাবে সুরেশকে জড়িয়ে ধরেছিল। সুরেশ তার স্পর্শে এক অভূতপূর্ব সুখানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। সে আরও ঘনিষ্ঠ হলো। হঠাৎ বাজ পড়লো। আকাশ চিরে বিদ্যুতের ঝলকানি। দামিনী সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করলো। এভাবে প্রায় দিন এই বাগানে হাসির খিল খিল শব্দ আর দামিনীর ভয় পেয়ে সুরেশের কাছে সমর্পণ এই ঘটনা প্রায় দিন ঘটতে লাগলো। স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে সুখানুভূতির স্মৃতিতে আচ্ছন্ন হয়ে রইলো সুরেশ।

আর এক দিনের ঘটনা। সেদিন দামিনী আসেনি। চাতালে বসে দামিনীর জন্য অপেক্ষা করতে করতে সন্ধ্যা গড়িয়ে কখন রাত হয়ে গেছে। নিশি রাত। আকাশে চাঁদ উঠেছে। মেঘেদের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার আলো। কখনো আলো, কখনও ছায়া। হঠাৎ সেই মেয়েলি কণ্ঠস্বর। খিল খিল হাসি। হাসতে হাসতে মেয়েটি একেবারে সুরেশের কাছে চলে এসেছে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে, কেমন যেন মোহাবিষ্টের মতো উঠে পড়লো সুরেশ। অজানা কিসের টানে মেয়েটিকে অনুসরণ করতে করতে চলে এলো বাগান যেখানে শেষ হয়েছে। তার কোনে এক ঝোপ জঙ্গলে এক ছোট্ট সরু এক খিড়কি দরজা। কখনও চোখে পড়েনি। দরজাটি এক বিশাল পাথর দিয়ে বন্ধ। মেয়েটি সামনে যেতেই পাথরটা সরে গেলো। দরজাটা খুলে গেল। মেয়েটি ইশারা করলো তাকে অনুসরণ করার জন্য। সুরেশ মন্ত্রমুগ্ধের মতো অনুসরণ করতে লাগলো। জ্যোৎস্নার আলোয় সরু মেঠো পথ, অনেকদূর গিয়ে রাস্তাটা এক অগভীর বনে প্রবেশ করছে। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে সুরেশ নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে পড়লো। মেয়েটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে

গেলো। কিছুক্ষণ পর সুরেশ দেখে মেয়েটি একদম কাছে দাঁড়িয়ে। চোখে চোখ রেখে বললো- "ভয় পাবে না। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব। আমার সাথে চলো.. "সুরেশের হাত ধরে এগিয়ে চললো মেয়েটি। বনের ভেতর অনেক পথ পার হয়ে গাছগাছালির মধ্যে একটা পুরানো জীর্ণ বাড়ি। বাড়ির ভিতর প্রবেশ করতে নজরে পড়লো বাড়িটি বাইরে থেকে যত পুরানো মনে হচ্ছিল তা নয়। আধুনিক বাড়িতে যা যা থাকে সব ব্যবস্থা আছে। দোতলায় একটা নিরিবিলি ঘর খুলে বললো- এখানে তুমি থাকবে। বাথরুমে স্নান সেরে ফ্রেশ হয়ে নাও।

আমি স্নান সেরে চুল মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে দেখে কেউ কোথাও নেই। সুরেশ আনমনে জানালায় আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কি সুন্দর নৈসর্গিক শোভা। বনের ভিতরে ঘর। আকাশে চাঁদ- নিস্তব্ধ, নিরিবিলি। কেউ কোথাও নেই। দুরে নিশাচর পাখিদের ডানা ঝটপটানির শব্দ। শিয়ালের ডাক।

হঠাৎ পায়ের আওয়াজে পিছন ফিরে দেখে সদ্যস্নাতা মেয়েটি ধূমায়িত চায়ের কাপ প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে। রাতের স্বল্প বাসে মেয়েটিকে মোহময়ী লাগছে। ভিজা লম্বা চুল কোমর ছাড়িয়ে নীচে নেমে এসেছে।

লম্বা বাহুযুগল। লাল টুকটুকে গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট। হালকা ভাবে জড়ানো রাতের পোষাক। চোখে এক অভূতপূর্ব আকর্ষণ। সুরেশ চায়ের কাপ হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার নাম কি? আমাকে কেন এখানে ডেকেছো?"

মেয়েটি বললো, "আমার নাম কামিনী। তুমি আমার ক্লাস মেট। আমরা একসাথে খেলা করতাম। আমার খুব ভালো লাগতো তোমাকে ছোটবেলায়। একসাথে খেলতাম। সেই থেকে ভালোবাসা..তোমাকে আজও আমি ভালোবাসি।" হঠাৎ সুরেশের ছোটবেলার কিছু স্মৃতি মনে পড়তে লাগলো।

কামিনী চায়ের প্লেটটা হাত থেকে নিয়ে বললো, "এমা তোমার চুল দিয়ে জল ঝরছে। তারপর তোয়ালে নিয়ে চুল মুছে দিতে গিয়ে কাছাকাছি আসতেই শরীরের স্পর্শে এক অনুভুতিতে সুরেশ বিচলিত হলো। অষ্টাদশী কামিনী সুরেশের বুকে হাত রেখে বললো- "আমি তোমাকে দূর থেকে দেখি। তোমাদের বাগানের চাতালে তোমার ও দামিনীর মিলন দৃশ্য দেখেছি। আমার দীর্ঘদিনের কামনা আজ পূর্ণ হলো।"

রাত গভীর হলো। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন.. বীভৎস এক চীৎকার। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো সুরেশের।

সে দেখলো এক দশাসই পুরুষ তার দিকে এগিয়ে আসছে। বীভৎস। হাতে ধারালো এক কাটারি। তাকে মারতে উদ্যত।

কামিনী..... চীৎকার করে উঠলো সুরেশ। চারিদিকে চাপ চাপ অন্ধকার। নিশাচর পাখির ডানা ঝটপটানি আর চীৎকার। চারিদিকে শুধু আঁধার। কোথায়, কিছুই বুঝতে পারছে না, নিজের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে না।

হাতড়াতে হাতড়াতে সুরেশ উঠে বসলো ধড়ফড় করে- ঘেমে গেছে, মাথা ভার। ভালো করে চোখ রগড়ে দেখে বসে আছে নিজের ঘরের বিছানায়। স্মৃতি রোমন্থনে কখন যে চোখ লেগে গেছিল! বুঝতে পারে নি...

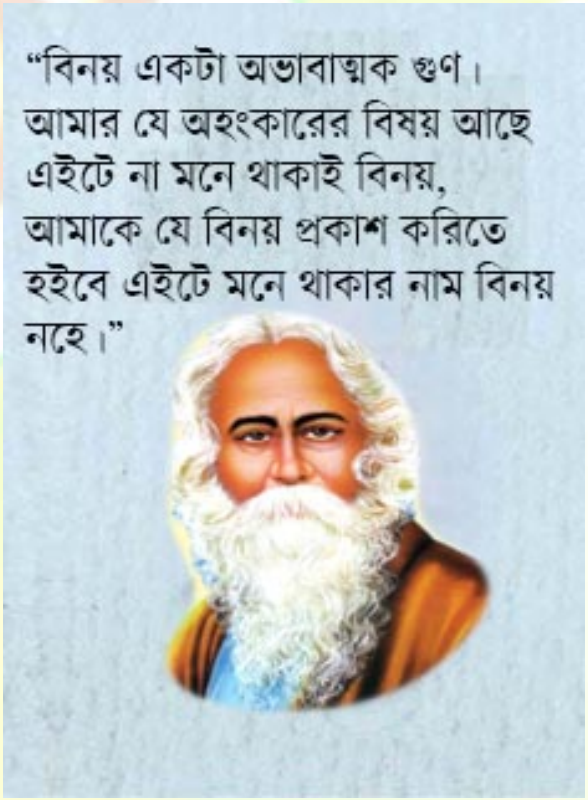

উৎসব সমাচার

পারমিতা ভট্টাচার্য

হ্যামলিনের বাঁশি, পরিণত একটা দিনের করিডোরে এসে ঠোঁট ডোবালে
বাসন্তিক ফুলরেণু ওড়ে শহরে, ফাল্গুনের আঁচল জুড়ে.....

অরণ্যের কোল ঘেঁষে ঘুমানো গ্রাম জেগে উঠে মাদল- মহুয়ার যুগলবন্দিতে
উৎসবচরিতায় ঋদ্ধ হয় যাপনের পর্বনামা.....

মন খারাপি মেঘ, চোরা অলিগলি রঙের মোহে বেনী বাঁধে চুলে,

কীর্তনখোলা বয়ে চলে সূর্যাস্তের দিগন্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
তার আবীর গোলা জলে বছরের সব ক্লেদ মিশে গেলে.....
দিগন্তে সিমন্তনীর সিঁথি জুড়ে সিঁদুর দানের পর্ব শুরু হয়.....

যে মেয়েটি জোছনায় পথ ভুলে, দরজায় কড়া নাড়ে
তাকে আমি ছুঁয়েও দেখিনি.....
আমার শরীর জুড়ে তখনও মাঘের শীত,
নিখুঁত উপাচারে সাজিয়ে রেখেছি বোধ-হন্তারকের ইতি বৃত্তান্ত....

শুধু আকাচা বিছানা জানে নির্ঘুম ফাল্গুনী রাত কোন গোত্রের সংবাদ আনে রোজ ভোরে.....

লালিমা

অমল দাস

এখন সূর্য ডুবে গেছে...
একটু আগেও আধো রক্ত, আধো লালে চেয়েছিল
বিষণ্ন অবেলার ক্লান্ত পৃথিবীর দিকে।
এইতো একজোড়া পাখি স্বরলিপি মুখুস্থ করছে তড়িতের তারে।
আমি গোধূলির আভা গায়ে একলা পায়চারী ছাদে
আকাশের নীলে চিলে-মেঘে খেলা দেখি! দেখি-
দূর সবুজের মাঠে কুয়াশার নগ্নতা ডাক দেয় ইশারায়।
উঠোনের তুলসীর গন্ধ নিয়ে শিউলির তল দিয়ে
আমি আল পথে হেঁটে যাই
প্রসবা ধানের শিষের নিষিক্ত নিষিদ্ধ গভীরে।
শিশির স্নাত-ঘাস পা ধুয়ে স্বাগত জানায় আহ্লাদে
থোকা থোকা কাশেদের ফুল সোহাগে চুমু আঁকে
ছুঁয়ে যায় রোমকূপ -বয়ে চলে রক্ত শিরায়।
কুয়াশার দানা বাঁধা মাকড়ের জাল চোখে মুখে
উষ্ণ চুম্বনের মত লেগে আছে ঠোঁটে গালে ললাটে।
অপমান লাঞ্ছনা পরাজিত গ্লানি ভেসে যায় হাওয়ায়,
চুল্লির নির্গত বিষাক্ত কার্বনের অভিমুখে!
বিগত পরিসংখ্যান মেলাতে চায়না বিদীর্ণ মন!
যে সাদা পাতা সেদিন ছিঁড়ে খানখান করেছো
তা ওভাবেই পড়ে থাক ধূলির মেঝেতে।
কোন এক অনাকাঙ্ক্ষিত অবসরে আগুনের জ্বালে
'ব্লাক টি'—র চুমুক নিও কালশিটে বিবর্ণ ঠোঁটে।
আমি শৈত্যের মৃদু হাওয়া নিয়ে আগামীতে
কুয়াশার গ্রামে খুঁজে নেবো কবিতার বসন্ত কুঁড়েঘর।

ভালোবাসার গান

জ্যোৎস্না ভট্টাচার্য ত্রিবেদী

আমি গাইবোনা সে গান
যে গানে সুর নেই লয় নেই
নেই ভালোবাসার তান।
যে গান শুধু মারতে শেখায়
হিংসা করে কাড়তে শেখায়
বঞ্চনা আর উন্মাদনার মন্ত্রে বলিয়ান।
আমি গাইবোনা সে গান....
আজ আর গাইবোনা সে গান।।

ও গানের সুর রক্ত নেশায় চূর
কথায় ফোটে হিংস্রতার বীজ
তালে তালে তার মৃত্যুর উল্লাস
সর্বনাশা বিধ্বংসী সে গীত।
সে গানে মন ভরে না আনন্দে,
কষ্ট নেশায় মদীর সে গান ছন্দে।
চোখের জল আর বুক ফাটা আর্তনাদ
ক্ষয়িষ্ণু সব না-মানুষের জাগার রাত।

আমি গাইবো না সে গান….
আজ আর গাইবোনা সে গান।।

আজ শুধু গাই ভালোবাসার গান
মন কেমনের কষ্ট ভোলায় সুখের অনুপান।
বৃষ্টিধারা যেমন ভেজায় শুষ্ক জমির মন...
তেমনি করেই আমার এ গান ভেজায় অনুক্ষন।
ভালোবাসার বীজ মন্ত্র ভেলকি দেখায় জাদুর,
সেই গানেতেই কষ্ট জীবন হবেই সবার মধুর।
শুষ্ক জমির মন ভিজলে ফসল সে দেয় ভরে
মানব জীবন ধন্য হবে ভালোবাসার ডোরে।।
তাই আজ শুধু গাই ভালোবাসার গান
আমি আজ গাইবো, সেই ভালোবাসার গান।।

আনন্দ'র খোঁজে

সীমা চক্রবর্তী

এক অবাস্তব আশায় কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নকে ভাসিয়েছি
সময়ের উত্তাল ঢেউয়ে একদিন যদি পাই তার খোঁজ,
যা খুঁজে চলেছি পৃথিবীর মুখ হয়ে...
কত পথে প্রান্তরে, কত মনের অলিগলিতে
কতোকার ঘরের প্রাঙ্গণে, কত বাস্তব ঝুলিতে
কত পান্থকে জিজ্ঞেস করেছি ----
উঁকি দিয়েছি কত শ্রমণের ভিক্ষা পাত্রে....
কত অবহেলিত আবর্জনায় খুঁজেছি হাতড়ে....

পাইনি আজও তো খুঁজে আনন্দকে,
সেই.... যে, বুদ্ধের অনুগত-
কষ্টের পুঞ্জীভূত মেঘ মনের ভিতর, যদিও সেটা ব্যক্তিগত।
দু"চোখের এই অপার তৃষ্ণা, অবাস্তব স্বপ্ন নিয়ে
হেঁটেছি পথে পথে ক্রোশ থেকে ক্রোশ,
বোধিবৃক্ষ তলে জপেছি আনন্দ'কে বুদ্ধ'নাম স্মরণ নিয়ে।

হতাশ হয়ে শেষে স্বপ্নকে ভাসিয়ে দিলাম কালের সাগরে
একদিন নিশ্চয়ই দেখা হবে তার সাথে
হয়তো আবারও প্রাচীন লুম্বিনী নগরে।
আনবেই সে তথাগত শান্তি....
পেনসিল দাগ রবারের মতো মুছে যাবে রেষারেষির ক্লান্তি,
শেষবারের মতো গর্জে উঠবে পৃথিবী
তারপর.... ইতি হবে ছায়া - ক্রান্তি।

মন দিয়ে মন বোঝা যায়, গভীর বিশ্বাস শুধু নীরব প্রাণের কথা টেনে নিয়ে আসে।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণের শহর কোলকাতা

ঋতুপর্ণা পতি কর

জব চার্ণকের সিটি অফ জয় এই রাজধানী কোলকাতা,
আবেগ ও ভালোবাসার এই শহর উন্নয়নেও বহন করে নিজস্ব স্বকীয়তা।
জাতি-ধর্ম-বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে সবারে আপন করে নেয় পাঁচমিশালী এই শহর কোলকাতা,
কত স্বপ্নপূরণের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা স্থবির কোলকাতাকে প্রাণবন্ত করে এ শহরের চূড়ান্ত ব্যস্ততা।
পরিবর্তনের সাথে পল্লা দিয়েও এ শহর হারাতে দেয়নি তার সাবেকিয়ানা,
ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে সমাদর করে নিজস্ব সত্ত্বায় এ শহর ধরে রেখেছে তার মুন্সিয়ানা।

সকালে শুরু দৌড় লক্ষ্যে পৌঁছোনোর, ট্রামে-বাসে ঠেসাঠেসি,
বিকেলে ভিক্টোরিয়া-নন্দন-প্রিন্সেপঘাটে, প্রেম গাঢ় হয় পাশাপাশি।
সন্ধ্যা নামে রাত ঘনায় এ শহর সেজে ওঠে আলোর রোশনাইতে,
আমাদেরই অজান্তে কত রহস্য ঘনীভূত হয় এ শহরেরই অলিতে গলিতে।
কারো রাত কাটে ভালোবাসার সুখ স্বপ্নে হয়ে বিভোর,
কারো চুপকথারা গোপনে ভিজিয়ে বালিশ তারাদের সাথে জাগে রাতভোর।

মানুষের পাশে মানুষ দাঁড়ায় আজও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে,
মনুষ্যত্বটা এখনো রয়েছে যায়নি তো তবু হারিয়ে।
আমার শহর, প্রাণের শহর, তিলোত্তমা কোলকাতা,
সাক্ষী হয়ে বহন করে কত ভাঙা-গড়ার ইতিকথা।
এ শহর হাসতে শেখায়, কাঁদতে শেখায়, শেখায় ভালোবাসতে,
শত প্রতিকূলতাতেও শহরের মানুষগুলো আমার থাকুক মিষ্টি-মুখে, মাছ-ভাতে।

"আমরা শুধু সামনের দিকেই এগুতে পারি; আমরা নতুন দরজা খুলতে পারি, নতুন আবিষ্কার করতে পারি কারণ আমরা কৌতুহলী। আর এই কৌতুহলই আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা"

- ওয়াল্ট ডিজনি

খুঁজে চলা সেই শব্দ

সুজাতা দাস

যেদিন তোর হাতে হাত রেখে নৈঃশব্দ্যর কথকতা শুনেছিলাম,
তুই না বোঝা ভাষাদের সাজাচ্ছিলি এক গভীর মনোযোগ সহকারে-
ভেসে বেড়ানো শেওলার মতো ভেসে চলা অজান্তেই শব্দের পরিখায়,
মন্দলাগা বা ভালোলাগার স্বত্ব সম্পূর্ণভাবে নিজের কাছেই গচ্ছিত রাখা-

যদি ডাক দিয়ে যাই অবেলাতে, নিঃশব্দ পদচারণায়-
মুখরিত করে স্মৃতি অন্য মুখে, জীবনের কথকতায়-
শৈশবের স্মৃতিতে হারিয়ে যাওয়া, ভবিষ্যতের দিগ্বিদিক-

তবুও এক মুঠো রোদ্দুর খুঁজে চলা জীবনের মতো।

ভেবেছিলাম রাত পরীদের গল্প শুনবো
কোনও জোনাক জ্বলা রাতে,
দু'হাতে ভরিয়ে দেবো শব্দ দিয়ে তৈরি
মুঠো মুঠো ছন্দের কবিতা।
যেখানে তোর আমার কথারা শব্দের
প্রাসাদ গড়বে কোনও দিন,
খুঁজে চলবো সেই শবদেহটাকে স্বর্গের রাস্তায়-
যেটা কলার ভেলায় ভেসে চলেছে আজও।

" যতদিন লেখাপড়ার প্রতি আকর্ষণ থাকে, ততদিন মানুষ জ্ঞানী থাকে,আর যখনই তার ধারণা জন্মে যে সে জ্ঞানী হয়ে গেছে,তখনই মূর্খতা তাকে ঘিরে ধরে। "

- সক্রেটিস

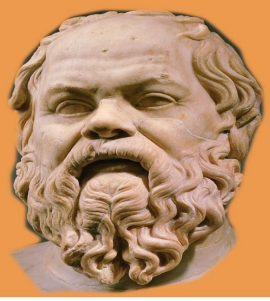

মেঘ পিওনের ডাক

পাপিয়া ঘোষ সিংহ

আজকে ভোরে সূর্য শিখা দেয়নি আমায় দেখা,
মেঘ পিওনের ডাক শুনলাম, চোখ মেলে তুই তাকা!
মেঘের হাতে কে পাঠালো, বৃষ্টি দিনের গান,
বসন্তের আজ বর্ষা সাথে প্রেমের উপাখ্যান-
ছোট, ছোট মুক্তো দানা পড়ছে ঝরে,ঝরে,
রোদের আজ রাগ হয়েছে, যায় না দেখা তারে।
টাপুর-টুপুর, বাদ্যি বাজে, কোকিলের গীত কই?
আমের মুকুল বৃষ্টি ছোঁয়ায় পড়ছে নুয়ে ওই।
লজ্জাবতী অবনতা, ডালিয়া, মল্লিকা,
অপরাজিতায় ভরেছে আজ ছাদবাগানের শাখা।
উদাস আমি আকাশ পানে দেখছি মেঘের সাজ,
মনপাখিটার ডানা মেলে, উড়িয়ে দিলাম আজ,
পৌঁছে গেলাম এক নিমেষে তেপান্তরের পারে,
ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর সেই ভালোবাসার নীড়ে।
সেথায় পেলাম, আমার সুজন, বসন্ত-রোদ্দুর,
উদাস এ মন, প্রাণ পেয়েছে, প্রেমে-ভরপুর।
বর্ষা যেমন আজকে এল বসন্তের বুকে নেমে,
ঠিক তেমনই আমরা দু'জন, উঠবো মেতে প্রেমে।

আশা

মানিক দাক্ষিত

তুমি আছো বলে আনন্দ-সুখ
আছে একটা আগামীকাল,
তুমি আছো বলে ঘুম থেকে উঠে
দেখছি একটা নতুন সকাল।
তুমি আছো বলে ক্লান্ত দেহটা
পাচ্ছে প্রতিদিন নতুন জীবন,
তুমি আছো বলে শরীর সতেজ
ডানা মেলে ওড়ে বিহঙ্গ-মন।
তুমি আছো বলে বখাটে চিন্তা
পারে নাকো এসে আড্ডা দিতে,
তুমি আছো বলে দু:খ শোকেরা
পারে না ভয়ে মিছিল করতে।
তুমি আছো বলেই রঙীন স্বপ্ন
ভিড় করে কত লক্ষ কোটি,
তুমি আছো বলেই আশা ভরসায়
পাহাড়ে চড়ি, চাঁদেতে হাঁটি।
তুমি আছো বলেই পৃথিবী সুন্দর
কত সাধ জাগে ফাগুন মনে,
তুমি আছো বলেই চাই না মরতে
বাঁচতে চাই এই মুগ্ধ ভুবনে।

কবি- মানিক দাক্ষিত

সমর্পণ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আমি মঞ্জরী হতে পারি
যদি কবরীতে দাও ঠাঁই।
আমি বনফুল হতে পারি,
তোমার অরন্যে পথ হারাই।

আমি মহাকাশ হতে পারি,
যদি ধ্রুবতারা সম জ্বলো।
আমার অনন্ত আঁধার রাতে,
দাও সৌদামিনীর আলো।

আমি সাগর হতে পারি,
যদি তটিনী হয়ে মিশে যাও।
আমার শারদ শরত প্রাতে,
তোমার শিশির ঝরিয়ে দাও।

আমি ভিখারী হতে পারি,
তৃণসম মাথানত করি।
দুফোঁটা অশ্রু হৃদয়ে ঝরিয়ে,
দাও পদবল্লভমুদারি।

"ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের ভিতর দিয়েই অনুভব করেন, দুঃখ ভোগ করেন। তাঁর গুণসমূহ, জ্ঞান, সৌন্দর্য এবং ভালোবাসা আমাদের প্রত্যেকের ভিতর দিয়েই প্রকাশিত হয়।"
- সর্বপলী রাধাকৃষ্ণন.

মন খারাপের দিন

অমিতাভ সরকার

হঠাৎ কোন অবসরে তুমি এসেছিলে,
কোন প্রস্তুতি ছিল না আমার।
এলে, জয় করলে, চলে গেলে..
পান্ডুলিপির ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে
তোমার দেখা পেলাম।
তুমি মনের দিক থেকে ভীষণ সুন্দরী ছিলে,
ঝর্ণার জলের মতো স্বচ্ছ হৃদয়,
তোমার কথায় কত আলপনা ছিল,
হাসতে খিলখিল করে।
ঠোঁটের মধ্যে কাঁপন ছিল, চোখ দুটোতে জাদু।
চুম্বকের মত আকর্ষণ ছিল,
আকর্ষণ ছিল বলেই তুমি পাণ্ডুলিপিতে স্থান পেয়েছিলে।
কিন্তু তুমি একি করলে,
যাত্রা পথের পথিককে কেন প্রশ্রয় দিলে-
বললে পান্ডুলিপি যত্ন ক'রে বেঁধে রাখো হৃদয়ের কোটরে,
মন খারাপ হলে আমাকে খুঁজে নিও।

কবি- অমিতাভ সরকার

ভ্যালেন্টাইন

- উজ্জ্বল সামন্ত

তোমার ঠোঁটের অমৃত ছোঁয়ায় সজীব রাখে মন,
আলিঙ্গনে আবদ্ধ প্রেম অন্তহীন অপেক্ষার ক্ষণ,
স্বর্গীয় সুখের ইন্দ্রজালে প্রিয়তমার ঠোঁটের কম্পন,
লিপস্টিক, সিগারেটের গন্ধ মিলে মিশে যায় যখন।

অনুভূতির শিহরণে রোমাঞ্চিত শুরু থেকে শেষে,
ভালোবাসার উষ্ণতা স্নিগ্ধ অনুভবে হৃদয়ে মেশে,
সময় যেন থমকে দাঁড়ায় কালবিলম্ব ঘড়ির কাঁটায়,
ভালোবাসার সমুদ্র মন্থনে উত্তাল ঢেউ ভাঙে আছড়ে।

লাজুক চোখে আলতো হেসে বলেছিলে ভালোবাসি,
অনুরাগের ছোঁয়ায় দুটি মন ভালোবেসে কাছাকাছি,
ফাগুন আগুন জ্বালায় তবু সবুজ ঘাসে পাশাপাশি,
হৃদয়ের অগ্ন্যুৎপাতে প্রেমের আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানি।

শুধু তোমারই জন্য বিভোর মনে ভালোবাসার রেশ
ভালোবাসার উৎযাপনে ফুল উপহার চকলেট
হলুদ শাড়ি হালকা লিপস্টিকে তোমাকে লাগছে বেশ,
মুহূর্তরা থমকে দাঁড়ায়নি সময় যেন দ্রুতই শেষ...

কবি- উজ্জ্বল সামন্ত

নাটক

"নারী শক্তি"

রাখী চক্রবর্তী

চরিত্র:- সীমা, রনিতা, ননীবালা দেবী, সবিতা দেবী, রুমপাই ও জনৈক ভদ্রলোক

দৃশ্যপট- পার্কে গাছ থাকবে কিছু। পার্কের বেঞ্চে বসে দুই বান্ধবীর গল্প।

প্রথম দৃশ্য

সীমা:- যতই রাত হোক বাড়ি ফিরে রুটি, ভাত, তরকারি সব রান্না করতে হয় বুঝলি। তোর মতো না যে পটের বিবি হয়ে থাকবো।
আমি ঘর সামলাই, অফিস করি, বাচ্চা মানুষ করছি। নারী তো করতেই হবে। নারী শক্তির মধ্যে ধৈর্য্য আছে, রহস্যও আছে।

(পাশের বেঞ্চে বসে দুই বন্ধুর কথোপকথন মন দিয়ে শুনছেন জনৈক ভদ্রলোক)

জনৈক ভদ্রলোক:- (স্বগতোক্তি)
সব নারী যদি আদর্শ নারী হবে তাহলে ভাগ্যের দোষ বলে কিছু থাকবে না। পল্টুর মা কুঁজো হয়েও লোকের বাড়ি কাজ করে আর বলে সবই ভাগ্যের দোষ ছেলে বৌমা থেকেও নেই।

রনিতা:- সীমা দেখ ঐ ভদ্রলোক আমাদের কথা গিলছে কেমন করে!
সীমা:- ছাড় তো ঐ সব লোক মেয়েলিপনা হয়। মেয়েদের কথা গেলে। জানিস তো রনিতা আমার শ্বশুর-শাশুড়ির ডিভোর্স হবে এবার।
রনিতা:- এই বয়সে!
সীমা:- আর বলিস না রোজ ঝগড়া করে দুজনে। রুমপাই তো সেদিন বলেই দিল তোমরা ডিভোর্স নিয়ে নাও ঠাম্মা-দাদু।
রনিতা:- ও মা।ঐটুকু বাচ্চা ডিভোর্সের মানে বোঝে?
সীমা:- আরে, সেইদিন আমার আর আমার হাসবেন্ডের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। আমি বলেছিলাম তোমাকে ডিভোর্স দেব। সেই থেকেই শিখেছে। আমার তো ওনাদের সাথে থাকতে একদম ভালো লাগে না। আমার বড় ভাসুর খুব চালাক। মা বাবার দায়িত্ব নিল না অথচ রোজ ফোনে বলবে, বাবা ওষুধ খেয়েছো। মা তোমার প্রেসার ঠিক আছে তো। আদিখ্যেতা সব। টাকা ছাড়ার বেলায় হাত মুঠো আর মুখে পটর পটর।
রনিতা:- আমার শাশুড়ি সব কাজ সেরে রাখে। আমাকে কুটোটি নাড়তে দেয় না। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে একটু রেস্ট নিয়ে খেয়ে দেয়ে বরের সাথে প্রেমালাপ করি।

সীমা:- কি লাকি তুই। খুব হিংসে হয় তোকে দেখে। এক কাজ করি চল আজ ডিনার করে বাড়ি ফিরবো। হাতে অঢে
ল সময় আছে। এমন সুযোগ তো আর পাবো না। তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল আজ।
রনিতা:- হ্যাঁ, যেতেই পারি। তবে একটা কাজ করি আজ বরঞ্চ তোর বাড়িতেই ডিনার করি। তুই আর আমি হাতাহাতি করে রান্না করে নেব। চিকেন কিনেই না হয় যাব
সীমা:- না, না তা হয় না। বাড়ির কাউকে না জানিয়ে তোকে নিয়ে যাব?
রনিতা:- এমন ভাব করছিস যেন বয়ফ্রেন্ডকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ঢুকছিস।
সীমা:- রবিবার আয় আমার বাড়িতে।
রনিতা:- আজই যাব, চল। কিছু মিষ্টি, চকলেক কিনে নিই রুমপাই-এর জন্য। চল ওঠ।
(মঞ্চ থেকে প্রস্থান- রনিতা সীমার।)

দ্বিতীয় দৃশ্য*

(দৃশ্যপট- রুমপাই ওর ঠাম্মার সাথে বসে লুডো খেলছে,রনিতা ও সীমা মঞ্চে প্রবেশ)

ননীবালা দেবী:- বৌমা আজ তাড়াতাড়ি এলে? বসো আমি চা করে আনছি। এ কে বৌমা?
(রনিতা ননীবালা দেবীকে প্রণাম করে)
রনিতা:- মাসীমা কেমন আছেন? আমি সীমার বন্ধু।

ননীবালা দেবী:- বেঁচে থাকো মা।
সীমা:- চিকেন আছে মা ।ব্যাগটা রাখো।
ননীবালা দেবী:- সে কি বৌমা! চিকেন আনবে একটু ফোন তো করতে পারতে। রাতের রান্না তো হয়ে গেছে। আটাও মাখা হয়ে গেছে। রাতে রুটিটা করে নেব।
রনিতা:- আপনি রান্না করে রেখেছেন মাসীমা?
ননীবালা দেবী:- হ্যাঁ মা, বৌমা পরিশ্রম করে বাড়ি ফেরে। তাই আমিই রোজ দুবেলা রান্না করি। আর তোমার মেসোমশাই বাজার দোকান করেন। তোমারা বিশ্রাম করো, চা জলখাবার নিয়ে আসছি।
রনিতা:- কাল শনিবার হাফ ছুটি। অফিস থেকে সোজা আমার বাড়ি যাবি কাল। রুমপাই এই নাও চকলেট, মিষ্টি সব তোমার জন্য। সীমা এই তোর সব সামলানো? এই তোর নারী শক্তি?

(রনিতা মঞ্চ থেকে প্রস্থান করে)

তৃতীয় দৃশ্য*

(দৃশ্যপট- রণিতার বাড়ি, সবিতা দেবী ইজিচেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন।
রনিতা ও সীমা মঞ্চে প্রবেশ করে)

রনিতা:- মা দেখো ,কাকে এনেছি
সবিতা দেবী:- কাকে এনেছো?
রনিতা:- আমার বন্ধু সীমা।

(সীমা নমস্কার করবে সবিতা দেবীকে)

সবিতা দেবী:- বেঁচে থাকো মা।
রনিতা:- মা চিকেন এনেছি। আজ রাতে চিকেন আর ফ্রায়েড রাইস করবো
সবিতা দেবী:- রোজই তো তুমি রাতে বাড়ি ফিরে রান্না করো বৌমা। আজ তুমি বন্ধুর সাথে গল্প

লেখক- রাখী চক্রবর্তী

করবে। আমি সব করবো।

সীমা:- ও রোজ বাড়ি ফিরে রান্না করে মাসীমা?

সবিতা দেবী:- সকালে সবার খাবার বানিয়ে অফিস যায়। রাতে বাড়ি ফিরে সবার জন্য খাবার বানায়। সব তো ও একাই সামলায়।

সীমা:- তুই যে বললি!

রনিতা:- আমার হাতের নখ দেখ। তোরটা দেখ। গতকাল পার্কে বসে তুই যখন মিথ্যে কথাগুলো বলছিলিস। আমি তখন তোর সুন্দর হাতের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বিশ্বাস কর একটুও হিংসা হয়নি আমার।

সীমা:- তাহলে আজকেরটা শুধু নাটক!

রনিতা:- উঁহু, নাটক না। আমরা নারী। আমরা সব পারি। শ্বশুর বাড়িকেও মন্দির বানাতে পারি। শ্বশুর শাশুড়িকেও মা বাবার স্থান দিতে পারি। শুধু একটা কাজই আমরা পারি না

সীমা:- কি পারি না?

রনিতা:- আমরা নারীরা শুধু নিজের জন্য বাঁচতে পারি না, সংসারের সবাইকে নিয়ে হাসিমুখে বাঁচতে পারি।

সীমা:- যাই রে,

(সীমা মঞ্চ থেকে প্রস্থান করে)

**শেষ দৃশ্য*

(দৃশ্যপট- সীমার বাড়ি। রান্নাঘরে ননীবালা দেবী বাসন মাজছেন। সীমা প্রবেশ করবে)

সীমা:- মা তুমি একটু বসো তো..

ননীবালা দেবী:- বৌমা তুমি বসো, আমি চা করে আনছি।

সীমা:- (ননীবালা দেবীকে জড়িয়ে)

মা, আজ আমি চা করে তোমাদের সবাইকে খাওয়াবো। দেখবো চা খেতে কতটা সুস্বাদু হয়।

(সীমা ননীবালা দেবীকে জড়িয়ে ধরে থাকবে,আবহে রবীন্দ্রসঙ্গীত-

"চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আআআলো,ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধ সুধা ঢাআলো)

অনুষ্ঠানের মুহূর্ত

লেখা পাঠান

Whatsapp-8910116253
Mail-alapimon@gmail.com

শ্রুতি নাটক

শিরোনাম:- খুশি থাকা

পায়েল সাহু

চড়ুই কর্তা: চড়ুই গিন্নী...ও চড়ুই গিন্নী... আরে দাঁড়াও না, বলি যাচ্ছো কোথায়? আরে একটু শোনো....
চড়ুই গিন্নী: বাসায় বসে বসে তো আর পারি না বাপু, এমন গরম পড়েছে কোনো গাছে একটু ফল নেই, কোথাও একটু জল নেই, আমার যে ক্ষিদে পায় (কান্না)
চড়ুই কর্তা: আহা! আহা! কেঁদো না, দেখছি আমি খুঁজে (বিষন্ন হয়ে)..

চড়ুই গিন্নী: চলো, আমিও যাই তোমার সঙ্গে, একসঙ্গে খুঁজেপেতে দেখি, যদি কিছু চোখে পড়ে।

চড়ুই কর্তা: চলো, তবে সাবধানে এসো কিন্তু.....

চড়ুই গিন্নী: হ্যাঁ গো, ওই যে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, বারান্দায় বেশ গাছপালা আছে দেখছি, চলো না একবার যাই ওখানে....

চড়ুই কর্তা: খেপলে নাকি? ওরা যদি দেখতে পায় সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দেবে, বলা যায় না ওদের বাড়িতে আবার খাঁচা আছে,আমাদের ধরে ওটার মধ্যে ঢুকিয়েও দিতে পারে, কি হবে বলো দেখি তখন?

চড়ুই গিন্নী: আ মোলো যা... আমাদের আবার খাঁচায় পোষে কে? আহা যদি পুষতো কি ভালোই না হতো, সময়ে সময়ে খাবারটা তো পেতাম।

লেখক- পায়েল সাহু

চড়ুই কর্তা: কি যা তা বলছো? এসো চুপিচুপি, খুব সাবধান, একটু খেয়াল রেখো।

চড়ুই গিন্নী: ওমা কি সুন্দর তুলসী গাছ, বাহ এই গাছের কচি কচি পাতা, মঞ্জরী খেয়েই তো আমাদের পেট ভরে যাবে, আর চিন্তা নেই, এখানেই আসবো রোজ....

(দুজনে মিলে পেট ভরে খাওয়ার পর ফুড়ুৎ করে উড়ে গেলো চড়ুই কর্তা আর গিন্নী।
এভাবে প্রতিদিন সকাল হলেই তাদের একটাই গন্তব্য।)

চড়ুই গিন্নী: হ্যাঁ গো, তুমি যে বলেছিলে এদের বাড়িতে খাঁচা আছে, তাতে পাখিও আছে, কই চোখে পড়লোনা তো এই কদিনে! আসলে তাড়াহুড়ো করে চলে আসি তো, কাল তো খুব জোর বেঁচে গেছি, ওদের বাড়ির লোকরা গায়ে জল দিতে আসছিলো, যদি পালক ভিজে যেতো আর তো উড়ে পালাতে পারতাম না, তখন বোধহয় ওই খাঁচায় পুরে রেখে দিতো।

চড়ুই কর্তা: সে কি গিন্নী? এই জন্যই বলি সাবধানে থাকো, ওদের ওই বারান্দার অন্য কোণে আছে খাঁচাটা, কাল গিয়ে দেখো।

(পরদিন সকাল...)

চড়ুই গিন্নী: ও ভাই বদ্রি, কি সুন্দর দেখতে গো তোমাদের, একটু আলাপ করতে এলুম, কতো খাবার খাঁচার মধ্যে, জলও আছে দেখছি, বাহ্ খুব ভালো লাগলো, আমাদের মতো কষ্ট করে উড়ে উড়ে তোমাদের খাবার আনতে যেতে হয় না, খুব সুখে আছো।

বদ্রি (সমস্বরে): চড়াই দিদি নাকি... এসো... এসো, বসো...দুটো কথা কই তোমার সঙ্গে, সারাদিন খাঁচায় বন্দী থাকি তো, কথা বলার কাউকে পাই না গো...

চড়াই কর্তা: তোমাদের চড়াই দিদির খুব শখ, খাঁচায় থাকবে, ভালো ভালো খাবে... খাঁচায় থাকা নাকি খুব আনন্দের।

বদ্রি (ম্লান হেসে): খাবে নাকি আমাদের খাবার চড়ুই দিদি? দাঁড়াও তবে, এই আমি ডানাটা ঝাপটাই, দাঁড়াও...

(বদ্রিকার ডানা ঝাপটানোয় বেশ কিছু দানা ছড়িয়ে পড়ে খাঁচার বাইরের মেঝেতে, চড়ুই দম্পতি ভীষণ আনন্দ করে খায়।)

চড়ুই কর্তা: তোমাদের জন্যে যে কিছু খাবার আনবো সে উপায় তো নেই, আমরাই খাবার খুঁজে পাইনা, অনেক কষ্টে এই বাড়িটা খুঁজে পেয়েছি, এদের তুলসী গাছের পাতাগুলো খেয়ে পেট ভরাই, ওদিকে আবার আমার গিন্নীর ডিম পাড়ার সময় হয়েছে ভাই বদ্রী,যেমন ভাবে হোক খাবার তো চাই, তাই ভয়ে ভয়ে হলেও এ বাড়িতে আসি।

বদ্রী দম্পতি: (সমস্বরে) আহা! আহা! আমরা আছি তো, তোমরা রোজ এসো, পেট ভরে দানা খেয়ে যেও, কোনো ভয় নেই।

(এভাবেই চড়ুই আর বদ্রীকা দম্পতির মধ্যে বেশ সুন্দর একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হলো,
চড়ুই দম্পতির বেশ কিছু ছানাও এখন আসে বদ্রীকাদের কাছে দানা খেতে।)

চড়ুই গিন্নী: তা, হ্যাঁ ভাই বদ্রি তোমরা কবে ডিম পাড়বে? বেশ কয়েকমাস হলো আসছি, তোমাদের ডিম পাড়ার কোনো সম্ভবনাই তো দেখি না।

বদ্রী: আমরা ডিম পাড়বো না গো চড়াই দিদি, কি লাভ বলো, সেই তো আমাদের ছানারাও আমাদের মতোই বন্দী জীবন কাটাবে খোলা আকাশের স্বাদ, স্বাধীনতা কিছুই পাবে না। এই খাঁচায় জন্মে খাঁচাতেই মরে যাবে, আমরা চাই না আমাদের ছানাদের এমন জীবন। পেট ভরে খেতে পাওয়াটাই যে সব নয় দিদি, আমরা পাখি, খোলা আকাশই আমাদের একমাত্র আনন্দ, সেটাই যে হারিয়ে গেছে আমাদের জীবন থেকে।

চড়ুই গিন্নী (কেঁদে ফেলে): সত্যি তো, কোনোদিন তো এভাবে ভেবে দেখিনি, আমরা ভেবেছি খাবার পাওয়ার কষ্টটাই বোধহয় সবচেয়ে বড়ো।

চড়ুই কর্তা: দেখেছো তো গিন্নী, আমি তোমাকে এই জন্যই শুরু থেকে বলতাম এ বাড়িতে সাবধানে আসার জন্যে, যদি ধরা পড়ে যাই আর আমাদের খাঁচায় ঢুকিয়ে দেয়, তার চেয়ে কষ্ট আর কিছুতে নেই।

বদ্রী: আসলে কি জানো ভাই, আমরা কেউই নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট হতে পারি না, শুধু অন্যকে দেখে ভাবি ও না জানি কতো সুখে আছে, ওর মতো জীবন আমার কেন নয়, এই দুঃখতেই মরি।

(পরদিনই ওই বাড়ির বারান্দার গ্রিল ঢাকা পড়লো মোটা জালে, কারণ চড়াই পাখির উপদ্রব ভীষণ বেড়েছে, গাছের পাতা নষ্ট করা থেকে শুরু করে খাঁচার পাখির খাবার খেয়ে নেওয়া, এতো বড়ো ক্ষতি তো মেনে নেওয়া যায়না।)

(দুদিন পর... চড়াই কর্তা এসে বদ্রীর খাঁচার কাছে উপস্থিত হয় জলের একটা ফাঁক দিয়ে।)

বদ্রী: একি গো চড়ুই দাদা, কিভাবে এলে তুমি? শিগগিরই পালাও, ওরা যদি তোমাকে ধরতে পারে তাহলে আর রক্ষা নেই। এই নাও ক'টা দানা তোমার ছানাদের জন্যে, আর এসো না।

চড়ুই কর্তা: আজ আমি দানা নিতে আসিনি বদ্রী, তোমাদের বড্ড ভালোবেসে ফেলেছি তো, তাই একটু তোমাদের দেখতে এলাম আর একটা কথা বলতে এলাম।
এক জীবনে সমস্ত সুখ বোধহয় কেউই পায়'না জানো, আমরা পাখি, খোলা আকাশে উড়ে বেড়ালেও খাবার পাইনা, ছায়া পাইনা তেমন, জলের কষ্টও খুব, তবু বেঁচে তো আছি। আর তোমরা বন্দী জীবন কাটালেও খাবারের কষ্ট তোমাদের নেই, তবু তোমাদের উড়তে চাওয়ার ইচ্ছেটাই এই মুহূর্তে বড়ো। তোমরা খাঁচার পাখি, খাঁচাতেই জন্ম, ডানা মেলতে তেমন দক্ষ নও যদি ভুল করে বেরিয়ে পড়ো চিল, কাক, শকুন বসে আছে তোমাদের খাবার জন্যে।

মানুষ যেমন আমাদের ভালোবাসে না, তেমনই তোমাদের আদর করে পুষে রাখে নিজের কাছে। আমরা যে যতটুকু পাচ্ছি সেটাতেই খুশি হতে শিখি না হয় এবার....
বাস্তবটা যে বড্ড কঠিন ভাই, ভালো থেকো তোমরা, আমি এসে তোমাদের খোঁজ নিয়ে যাবো মাঝে মাঝে।

বদ্রী: সত্যি তো এভাবে তো ভেবে দেখিনি আগে, আর দেরি নয়, এবার আমরাও আমাদের ছানা পোনা নিয়ে সংসার পাতবো এই খাঁচার নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে, নাই বা পেলাম খোলা আকাশ, তবু মৃত্যুভয় তো থাকবে না।
এতদিন ভালোবাসা নিয়ে গেছি, এবার নাহয় ফিরিয়ে দিতেও শিখি, ভালো থেকো তুমিও চড়ুই দাদা।